তাপস-কাহিনী।

(আউলিয়া অর্থাৎ মুসলমান মহর্ষিগণের অলৌকিক জীবনী-সংগ্রহ।)

শ্রীমোজাম্মেল হক্-প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কলিকাতা
২৯ নং ক্যানিং ষ্ট্রীট হইতে
নাথ এণ্ড কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৩২১ সাল।

মূল্য ।৵ আট আনা মাত্র।

বিজ্ঞাপন।

এক সময়ে মুসলমানগণ উন্নতির স্বর্ণসিংহাসনে রাজাধিরাজ-রূপে বিরাজিত ছিলেন। কি অতুলনীয় শৌর্য্যবীর্য্যশালী দিগ্বিজয়ী বীরপুরুষ, কি অলৌকিক জ্ঞান-রত্নমণ্ডিত ধর্ম্মরত তপস্বী, কি অগাধ ধীশক্তিশালী প্রিয়বাদী পণ্ডিত, কি অসাধারণ কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন মধুরকণ্ঠ মহাকবি, আমাদের ইহার কিছুরই অভাব ছিল না। পরিচয় কি দিব? সুসভ্য মুসলমান জাতির অশেষ জ্ঞানের আকরস্বরূপ সাহিত্য-বিজ্ঞান ও কাব্যেতিহাস অনুসন্ধান করুন, অধুনা এ পতিত জাতির বিগত জীবনের অমানুষিক কার্য্যকলাপ—অস্তগত রবির শেষ চিহ্ন—উজ্জ্বল রশ্মি দর্শনে বিস্ময়-সাগরে নিমজ্জিত হইবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা বর্ত্তমান গ্রন্থে এরূপ কতিপয় মহাতপা আউলিয়ার অর্থাৎ মুসলমান মহর্ষির জীবন-কাহিনী বিবৃত করিব, যাঁহাদের ধ্যান-ধারণা, অলৌকিক তপোনিষ্ঠা ও ঈশ্বর-প্রেমিকতার বিষয় অবগত হইয়া পাঠককে নিঃসন্দেহে বিস্মিত ও চমকিত হইতে হইবে। আউলিয়াদিগের মধ্যে মহাপুরুষ হজরত আবদুল কাদের জিলানী (যিনি সাধারণতঃ বড় পীর নামে খ্যাত) অলৌকিকত্বে ও গুণ-গরিমায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সুতরাং আমরা সর্ব্বাগ্রে সেই পরম শ্রদ্ধেয় প্রধান পুরুষেরই জীবনবৃত্তান্তের

আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। এক্ষণে সেই সর্ব্বসিদ্ধিকর্ত্তা সর্ব্ব-মঙ্গলময় মহামহিম বিশ্বস্রষ্টার নিকট এই প্রার্থনা, তাঁহার পরম-প্রিয় অকৃত্রিম ভক্তবৃন্দের স্বর্গীয় চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া ভ্রম-বশতঃ যদিই কোন ত্রুটি বা তাঁহাদের নিষ্কলঙ্ক নামের অসম্ভ্রম ঘটে, তবে তিনি এ দীনাত্মা অকিঞ্চনকে যেন কৃপা বিতরণে ক্ষমা করেন। ইহাতে ভাব ও ভাষাগত ভ্রমপ্রমাদ লক্ষিত হইলে সহৃদয় পাঠকগণ স্বীয় গুণে উদারতা প্রদর্শন করিবেন, ইহাও অন্যতর নিবেদন ইতি।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন

বহু সহৃদয় গ্রাহকের আগ্রহ দেখিয়া তাপস-কাহিনী নামে তাপস-জীবনীর দ্বিতীয় সংস্করণ হইল। এই সংস্করণে ইহার স্থানে স্থানে সংশোধিত এবং ইহাতে তাপস নিজামউদ্দীন আউলিয়ার জীবনী সন্নিবেশিত হইয়াছে। এক্ষণে শিক্ষিত সাধারণে ইহার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিলে আমি পরিশ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

শান্তিপুর। বিনয়াবনত লেখক—

১৩২১ সাল, বৈশাখ। মোজাম্মেল হক্।

তাপস-কাহিনী।

১। তাপস-প্রবর হজরত আবদুল কাদের জিলানী।

—•:•:•—

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মহাত্মার সুপবিত্র নাম লিখিত হইল, তিনি করুণাময় জগৎপিতার অপার কৃপায় অনন্তগুণের বহুবিধ অলৌকিকতা ও সদ্‌গুণ-বিভূষিত হইয়াই ইহলোকে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি সাধু-সমাজের শিরোভূষণ এবং জনসাধারণের পরম ভক্তিভাজন পূজনীয় ঋষি ছিলেন। তাঁহার সাধুতা, তত্ত্বজ্ঞান ও ধর্ম্মলিপ্সা অদ্বিতীয় ছিল। তিনি আবাল্য বিশুদ্ধ-চরিত্র, সত্যপ্রিয় ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। তাঁহার বিস্ময়কর মাহাত্ম্য, অমানুষিক প্রতিভা, গম্ভীর চিন্তাশীলতা এবং চিত্তের একাগ্রতা শৈশব হইতেই পরিস্ফুট হইয়াছিল। জিলান (গিলান) নামক জনপদে হিজরী ৪৭১ সালের ১লা রোমজান মাসে তাঁহার জন্ম হয়। জন্মভূমির নামানুসারে তিনি হজরত আবদুল কাদের জিলানী নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

হজরত আবদুল কাদের জিলানী জগতারাধ্য সৈয়দ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম সৈয়দ আবু সালেহ, মাতা সৈয়দ-বংশোদ্ভব আবদুল্লা সোমায়ীর দুহিতা পবিত্র-হৃদয়া পুণ্যবতী বিবি ফাতেমা। ইহাঁরা জীবনের দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন। অতঃপর জননীর ষষ্টি বর্ষ বয়ঃক্রমকালে হজরত আবদুল কাদের পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। তাঁহার জন্মগ্রহণের পর তাঁহার আর একটী ভ্রাতা জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু সেই ভ্রাতা যৌবনকালেই কালগ্রাসে পতিত হন। বিধাতা হজরত আবদুল কাদের জিলানীকে যেমন অনুপম গুণ-রাশিতে ভূষিত করিয়াছিলেন, তদ্রূপ নরলোক-দুর্ল্লভ নয়নাভি-রাম রূপলাবণ্যও প্রদান করিয়াছিলেন। ফলতঃ তিনি রূপে-গুণে সুরভিপূর্ণ প্রস্ফুটিত প্রসূন সদৃশ মনোজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সৌম্য মূর্ত্তি, তাঁহার সুন্দর গঠন-সৌষ্ঠব, তাঁহার মধুময় প্রকৃতি দর্শনে দর্শকমাত্রেই বিমোহিত হইতেন।

হজরত আবদুল কাদের জিলানীর উপর পরম কারুণিক বিশ্বপতির অনুগ্রহ অসীম ছিল। সেই জন্য সেই সদ্যপ্রসূত অবস্থাতেই তিনি স্বকীয় ধর্ম্মপরায়ণতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। পরন্তু তাহা যে সেই বিশ্বস্রষ্টার লীলাসমুদ্রের তরঙ্গমালার অন্যতম লহরী বিশেষ, তাহাতে আর সংশয় নাই। কথিত আছে, তিনি পবিত্র রোমজান মাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া মুসলমান-জগতের অবশ্যপালনীয় রোজা-ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন; প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাবধি, এই দীর্ঘ সময়ের

মধ্যে শত যত্নেও মাতৃস্তন্য পানে বিরত থাকিতেন। অপরন্তু পরবর্ত্তী কোন সময়ে রোমজান মাসের রোজা-ব্রতের পূর্ব্বে দূত স্বরূপ চন্দ্র দর্শনে ব্যাঘাত জন্মে। তজ্জন্য সেই রাত্রিতে উপবাস-ব্রতের সঙ্কল্প ও অনুষ্ঠান করিবে কি না, তদ্বিষয়ে সকলের মনে ঘোর সংশয়ের সঞ্চার হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সর্ব্ব সমাজেই আন্দোলন চলিতে থাকে। নানা বাদানুবাদের পর অনেকে সন্দিগ্ধচিত্তে রোজার সঙ্কল্প করেন। পর দিবস প্রত্যূষকালে জনৈক পুরমহিলা জিলানী-জননীকে প্রশ্ন করেন যে, কোন স্থান হইতে চন্দ্র-দর্শনের সংবাদ আসিয়াছে কি না এবং অদ্য রোজা রাখা শ্রেয়ঃ কি না? তদুত্তরে সেই বুদ্ধিমতী কামিনী বলেন যে, চন্দ্র-দর্শনের কোন সংবাদ প্রাপ্ত হই নাই বটে, কিন্তু চন্দ্র যে উদিত হইয়াছে, তাহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় নাই। কেননা আজ প্রত্যূষ হইতে আমার পুত্র স্তন্য ত্যাগ করিয়াছে। পবিত্র রোমজানে সেই সুকুমার শিশু দিবাভাগে কদাচ দুগ্ধপান করে না। তাই বলিতেছি, চন্দ্র নিশ্চয় উঠিয়াছে, রোজা রাখা কর্ত্তব্য। এই প্রসঙ্গ সাঙ্গ হইতে না হইতেই চতুর্দ্দিক হইতে চন্দ্র-দর্শনের সংবাদ আসিয়া সেই বাক্যের যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়া দিল। তখন সেই প্রশ্নকর্ত্রী সন্তুষ্ট হইয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং এই দেবশিশুর ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া অশেষ প্রকারে গুণানুবাদ করিতে লাগিলেন।

কোন এক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ মধ্যে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে যে, শৈশবকালে, যখন তিনি ধাত্রীর ক্রোড়দেশে থাকিয়া শান্তি-

সুখে স্তন্যপানে লালিতপালিত হইতেন, সেই সময়ে ঈদৃশ একটী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটে যে, তাহাতে তাঁহার অচিন্ত্যনীয় অলৌকিকতায় বিস্মিত ও চমকিত হইতে হয়। কথিত আছে, তিনি এক দিন অকস্মাৎ ধাত্রীর ক্রোড় হইতে শূন্যে উত্থিত হইয়া দ্রুত সুদূর আকাশমণ্ডলের দিকে প্রধাবিত হন এবং এত দূরে গমন করেন যে, যেন মুহূর্ত্ত মধ্যে সমুজ্জ্বল সূর্য্যের সমীপে যাইয়া উপনীত হন। সেই নরলোকের অগম্য ভীষণ স্থানে সেই জ্যোতির্ম্ময় দেবশিশু সূর্য্যের সম্মুখীন হওয়ায় নভোমণ্ডল সমুজ্জ্বল স্নিগ্ধ প্রভায় অধিকতর ভাস্বর হইয়া গেল এবং তাঁহার স্বর্ণকান্তি শরীর হইতে তেজঃপুঞ্জ বিনির্গত হইয়া সূর্য্যে প্রতিফলিত হইয়া এতাদৃশ চমকিত হইল যে, চতুর্দ্দিক বহুদূর পর্য্যন্ত সমুজ্জ্বল জ্যোতিঃ রাশিতে—বিদ্যুৎ-প্রভাগঞ্জন লহরীমালায় জ্যোতির্ম্ময় হইয়া গেল। ক্ষণকাল এই অবস্থায় অতিবাহিত হইলে পর তিনি পুনর্ব্বার ধাত্রীর ক্রোড়ে আসিয়া উপনীত হন।* ধাত্রী এই অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব বিচিত্র ব্যাপার দর্শনে নীরবে প্রস্তর প্রতিমাবৎ দণ্ডায়মান থাকিয়া অপলকনেত্রে চাহিয়াছিল এবং যৎপরোনাস্তি আতঙ্কিত ও বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু কাহারও নিকটে তাহা প্রকাশ করিতে সাহস করে নাই। যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সেই মহামহিম মহাপুরুষ জন্মভূমি জিলান পরিত্যাগ করত বোগদাদে ধর্ম্মোপদেশ বিতরণে সাধারণের ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিয়া হৃদয়ের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই

* "গোলদেস্তাএ কেরামত" দেখুন।

কালে উক্ত ধাত্রী তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া যথোচিত সম্মাননার সহিত ভূতল চুম্বনপূর্ব্বক বিনয়নম্রবচনে নিবেদন করে "হজরত! শিশুকালে একদা আপনি আমার ক্রোড় হইতে উত্থিত হইয়া শূন্যমার্গে সূর্য্যের সম্মুখে নীত হইয়াছিলেন। এক্ষণেও কি সেরূপ ঘটনা কখন ঘটিয়া থাকে?" তিনি বলিলেন, "ধাত্রি! এক্ষণে পূর্ব্ব ভাব আর নাই। সেই সময়ে আমার লঘু দেহ অক্ষুণ্ণ শ্রীসম্পন্ন বিশ্বপতির বিশ্বব্যাপী বিশাল জ্যোতির ঔজ্জ্বল্য সহ্য করিতে অক্ষম ছিল, আধার আধেয় ধারণের অনুপযুক্ত ছিল। সুতরাং সেই বিশ্বতেজঃকর্ত্তৃক আমি সহজেই আকৃষ্ট হইয়া যাইতাম—আমার দেহান্তর্গত ক্ষুদ্র জ্যোতিঃও নিষ্ক্রান্ত হইয়া সেই জ্যোতিঃ-রাশিতে যাইয়া সংযোজিত হইত। কিন্তু এক্ষণে করুণাময় খোদাতালা আমাকে এরূপ শক্তি প্রদান করিয়াছেন—আধার এরূপ সম্প্রসারিত হইয়াছে যে, আর কিছুতেই আমি বিচলিত হই না, আধেয় সম্পোষ্য করিয়া লই। এক্ষণে আমি প্রতিদিনই সেই জ্যোতিঃ দর্শন করি, তাহাতে কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে না। আমিই এক্ষণে তাহার আকর্ষক হইয়া পড়িয়াছি। শূন্যে উত্থিত হইবার আর আমার সম্ভাবনা নাই।"

বয়ঃবৃদ্ধির সহিত হজরত জিলানী বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুহস্তে সমর্পিত হন। সপ্তদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তিনি জন্মভূমিতে থাকিয়াই বিদ্যাশিক্ষা করেন। অতঃপর তাঁহার জ্ঞানার্জ্জন-লালসা ও বিদ্যাভ্যাসলিপ্সা সমধিক প্রবল হওয়ায় তিনি

তৎকালিক বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্রভূমি বোগদাদে যাইতে বাধ্য হন। তিনি স্বীয় জননীর নিকট বোগদাদ-গমনের অনুমতি প্রার্থনা করিলে সেই বুদ্ধিমতী পবিত্রহৃদয়া মহিলা যথোচিত কষ্টবোধ সত্বেও পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার আগ্রহাতিশয্য দর্শনে পরম পুলকিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ গৃহ মধ্য হইতে ১২০টী দিনার বহির্গত করিয়া তন্মধ্যে তাঁহার প্রাপ্যাংশ ৪০টী দিনার গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্রের বাহুমূলের নিম্নভাগে জামার মধ্যে গুপ্তভাবে বাঁধিয়া দিয়া সময়োচিত উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ করত বিদায় প্রদান করিলেন।

এইরূপে তরুণ বয়সে জননীর নিকট বিদায় লইয়া সাহসে নির্ভর করিয়া হজরত জিলানী জন্মভূমি জিলান হইতে বহির্গত হইলেন। এক দল স্থলবণিক বোগদাদ গমন করিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদেরই সহযাত্রীরূপে যাইতে লাগিলেন। যাইতে যাইতে বণিকদল একদা এক বিস্তীর্ণ প্রান্তরে যাইয়া উপনীত হন। সন্ধ্যাসমাগম হওয়ায় সকলে সেই স্থানেই রাত্রি যাপনার্থ অবস্থান করিতে লাগিলেন। হজরতও এক স্থানে শয্যারচনা করিয়া নিদ্রার কোমল ক্রোড়ে অঙ্গ বিস্তার করিলেন। যখন রজনী দ্বিপ্রহর, সকলেই নিদ্রাগত, সেই সময়ে সহসা এক ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইল। কোথা হইতে কতকগুলি ভীষণ দস্যু বণিকদলের উপর আপতিত হইল। দুর্ব্বৃত্তেরা তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইল। অধিকন্তু তাহাদের নির্দ্দয় ব্যবহারে সকলেই যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত ও প্রহৃত হইলেন।

এই সময়ে সেই সুচতুর তরুণ যুবা ঘোর বিপদ দেখিয়া আত্ম-রক্ষার্থ জননীর উপদেশানুসারে বিশ্বস্তচিত্তে শাস্ত্রোক্ত শ্লোক (দোওয়া) বিশেষ আবৃত্তি করিতে নিযুক্ত হইলেন। আহা এ জগতে বিপদে পরিত্রাণ-প্রদায়ক তাদৃশ অদ্বিতীয় তীক্ষ্ণাস্ত্র আর কি হইতে পারে? তিনি দয়াময়ের অনুগ্রহে তৎপ্রভাবে দস্যুদলের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে রক্ষা পাইলেন,—তাঁহার কেশস্পর্শ পর্য্যন্ত কেহ করিল না। তথাপি তাঁহার শ্লোকাবৃত্তির বিরাম নাই—চলিতেছেন, আর আবৃত্তি করিতেছেন। ইত্যবসরে লুণ্ঠনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেলে জনৈক দস্যু তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বলিল, "দরবেশ! তোমার সঙ্গে কি কিছু আছে?" এই প্রশ্ন শ্রবণমাত্র তাঁহার অন্তরে জননীর উপদেশ জাগরূক হইল। তিনি বিদায় প্রদান কালে বলিয়া দিয়াছেন, "বৎস! প্রাণান্তেও সত্যের অপলাপ করিও না।" সুতরাং এই ঘোর বিপন্ন সময়েও তিনি মিথ্যার অবতারণা করিয়া একবিধ অপরাধ এবং তদুপরি জননীর আজ্ঞাবহেলন, এই উভয়বিধ অন্যায়াচরণে কি লিপ্ত হইতে পারেন? কখনই না। তিনি, সেই আজন্ম শুদ্ধ-চরিত, সত্যব্রত মহাপুরুষ প্রশ্নমাত্র অম্লানবদনে বলিয়া ফেলিলেন, "আমার কাছে চল্লিশটী দিনার আছে এবং তাহা আমার বাহুমূলনিম্নে জামাতেই আছে।"

দস্যু, এই সত্য কথায় ফকির উপহাস করিতেছেন বোধে, তাহাতে আস্থা স্থাপন না করিতে পারিয়া অন্য দিকে প্রস্থান করিল। কিছুক্ষণ পরে অপর এক জন আসিয়া পুনঃ প্রশ্ন করিল,

তিনিও পূর্ব্বের ন্যায় যথার্থ উত্তর প্রদান করিলেন
সেই দুর্ব্বৃত্ত তস্কর দস্যুপতির নিকটে যাইয়া সমুদয় বিবরণ করিল। দস্যুরাজ তখনই তাঁহাকে আনয়ন করিতে অনুমতি করিল। হজরত দস্যুদলে উপনীত হইয়া দেখেন যে, দলপতি লুণ্ঠিত দ্রব্য বিভাগ করিতে ব্যাপৃত আছে। সে তাঁহাকে দেখিয়া গম্ভীর স্বরে বলিল, "বালক! তোমার নিকটে কি আছে?" উত্তর পূর্ব্ববৎ। তিনি সেই শত্রু-পরিবেষ্টিত ভীষণ স্থানেও সত্য গোপন করিলেন না, অধিকন্তু সেই দিনার বাহির করিয়া দেখাইলেন। দস্যুপতি এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত ও চমকিত হইয়া কহিল, "যুবক! তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, যথার্থ উত্তর প্রদান করিবে। দেখ, আমরা পরস্বাপহারী দস্যু, ইহা তুমি অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছ। দস্যুর গোচরীভূত না করিয়া ধনরত্নাদি গুপ্তভাবে রাখাই জনসাধারণের ধর্ম্ম। কিন্তু তোমার স্বভাব তাহার বিপরীত দেখিতেছি। তুমি নিজ অর্থাদি আমাদের নিকট অপ্রকাশ রাখিলে তোমার পক্ষে শ্রেয়ঃ হইত, কেহই লইতে পারিত না। কিন্তু তুমি পূর্ব্বাপর যথার্থ কথাই বলিয়া আসিতেছ। ইহার কারণ কি? আমি শুনিতে ইচ্ছা করি।" তখন সেই সত্যসেবক ধর্ম্মবীর ইহা শুনিয়া বলিলেন, "আমার মাতার নিকট আমি প্রতিশ্রুত আছি যে সত্য ব্যতীত মিথ্যা কথা আমি বলিব না। সেই জন্যই আমি সত্য গোপন করি নাই; যদি করিতাম, তবে আজ মাতৃ-আজ্ঞা অবহেলনজনিত দুরপনেয় পাপপঙ্কে

হইতাম এবং মিথ্যাকথাজনিত পাপেও আমাকে লিপ্ত হইতে হইত। এই উভয় পাতক হইতে নিষ্কৃতি-লাভ জন্যই আমি সত্য-গোপন করি নাই।"

এই জ্ঞানগর্ভ মধুর কথা শ্রবণ করিয়া দুষ্কর্ম্মান্বিত দস্যু-অধিনায়কের চিত্ত চমকিত হইল, তাহার শরীরের স্তরে স্তরে যেন বিদ্যুৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইতে লাগিল। মনে অনুশোচনার উদয় হইল। সে ধীর কাতর বচনে বলিল, "আপনি গর্ভধারিণী জননীর বাক্যাবহেলনে পাপ স্পর্শিবে, এই আশঙ্কায় এই ভীষণ সঙ্কটস্থলে দস্যুর সমক্ষেও সত্য রক্ষা করিলেন। ধন্য আপনি! ধন্য আপনার জননী! ধন্য আপনার ন্যায়পরতা!! আর আমরা?—ধর্ম্মজ্ঞান-বিবর্জ্জিত চিরপাপরত আমরা? হায় পাপের প্রলোভনে পড়িয়া সেই স্বর্গীয় পরাৎপর আল্লাহ তায়ালার মঙ্গলময় অনুজ্ঞা অনুদিন-পদদলিত করিতেছি। এই পুরীষপূরিত অনিত্য দেহের পোষণার্থ, পুত্র-কলত্রাদির জীবন রক্ষার্থ কত লোকের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন, কত নিরীহ নরের জীবন সংহার এবং আরও কতবিধ অসদাচরণ করিতেছি। হায় আমাদের ন্যায় নরাধম অকৃতজ্ঞ মহাপাপী লোক আর কে আছে? ধিক্ আমাদের জীবনে, ধিক্ আমাদের কার্য্যে, ধিক্ আমাদের মানব নাম ধারণে! অহো পরিণামে আমাদের কি গতি হইবে?"

দস্যু-দলপতি উক্তরূপ অনুশোচনার সহিত কম্পিত কলেবরে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। তাহার নয়নযুগল হইতে অবিরলধারে অশ্রু বিগলিত হইয়া বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিতে

লাগিল। বাক্য-রহিত, ঘন দীর্ঘ শ্বাসের বিরাম নাই। অবশেষে দস্যুদলপতি সদল-বলে সেই সত্যব্রত পুণ্য-পুরুষের সমক্ষে একাগ্রচিত্তে খোদার নামে শপথ করিয়া তওবার* সহিত আপনাদের চিরঘৃণিত দস্যুবৃত্তি পরিহারার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল এবং বণিকদলের তাবত ধন-সামগ্রী যথাযথ প্রত্যর্পণ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তখন সেই সাধু-শিরোমণি হজরত জিলানীর সুকৃতিগুণে পাপীগণ নবজীবন লাভ করিয়া ও বণিক-দল হৃত দ্রব্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সকলেই তদীয় সাধুতায় মুগ্ধ ও অনুরক্ত হইল। দস্যুদল হজরতের পদতল-বিলুণ্ঠিত হইয়া হৃদয়ের ভক্তি ভালবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনান্তর তাঁহার শিষ্যত্বে দীক্ষিত হইল।

কথিত আছে, উক্ত দস্যুরাজ এইরূপে সদ্গতি লাভ করত হজরত জিলানীকে অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া আপন আবাসে লইয়া যায়। গৃহে দস্যুরাজের এক পরম রূপলাবণ্যবতী অবিবাহিতা সুশীলা দুহিতা ছিল। তাহার অনিবার্য্য অনুরোধে হজরত সেই কন্যার পাণিপীড়ন করেন। বিবাহান্তে স্ত্রীকে পিত্রালয়েই রাখিয়া তিনি স্বীয় অভীষ্ট সাধনার্থ বোগদাদে প্রস্থান করেন।

বোগদাদ নগরে উপনীত হইয়া হজরত জিলানী উপযুক্ত শিক্ষাগুরুর তত্ত্বাবধানে আন্তরিক যত্ন ও শ্রমের

* তওবা—কৃতাপরাধ ক্ষমার জন্য জগৎপিতার নিকট প্রার্থনা ও পুনর্ব্বার না করবের দৃঢ়তা।

সহিত বিদ্যা-শিক্ষায় মনোযোগী হন এবং স্বীয় প্রখর প্রতিভাবলে শীঘ্রই সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া গভীর ধী-শক্তিমান পণ্ডিত নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি পবিত্র কোরাণ খানি এরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, প্রয়োজনানুসারে যে স্থান হউক্‌ না কেন, অবলীলাক্রমে আবৃত্তি করিতেন। ফলতঃ তাঁহার যশঃ, মান ও সম্ভ্রম দেশদেশান্তরে সর্ব্বসমাজেই পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছিল। এই তরুণ বয়সে তিনি সর্ব্বত্র প্রগাঢ় পণ্ডিত ও গভীর তত্ত্বজ্ঞ বলিয়া খ্যাতি ও প্রতিপত্তিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু প্রথমতঃ সেই জ্ঞান প্রচার-কার্য্যের দ্বারা সাধারণে বিতরণ করিতে সাহস করেন নাই। অতঃপর ঘটনা পরম্পরায় তদীয় বক্তৃতা-শক্তির উৎকর্ষ সাধিত হইলে, তিনি ধর্ম্মপ্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি সেই কার্য্য এরূপ হৃদয়গ্রাহিণী ওজস্বিনী ও মধুর ভাষায় সম্পাদন করিতেন যে, তাহাতে সংখ্যাতীত লোকের সমাগম হইত এবং শ্রোতৃবৃন্দ তন্ময় হইয়া নিস্পন্দ জড়পদার্থের ন্যায় সুস্থিরভাবে বিস্ময়নেত্রে চাহিয়া রহিত।

এই সময়ে জনৈক সওদাগর বোগদাদে আসিয়া উপনীত হন। তিনি পূজ্যপাদ মহর্ষির ধর্ম্মকথা শ্রবণ মানসে তাঁহার নিকটে একটী মসজিদে গমন করেন। তিনি দেখিলেন, সাধক-প্রবর মিম্বরে (বেদিতে) উপবিষ্ট হইয়া হৃদয়-মনোরঞ্জন মধুর স্বরে ধর্ম্মোপদেশ বিতরণ করিতেছেন, আর তাঁহার

চতুর্দ্দিকে সংখ্যাতীত মানব ধীরভাবে বচনামৃত পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছেন। সওদাগরও সেই জনতার মধ্যে আসন গ্রহণ করিয়া হজরতের বাক্যামৃত পান করিতে লাগিলেন কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে পর তাঁহার শৌচপীড়া এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, তিনি একেবারে অস্থির হইয়া পড়িলেন, উঠিয়া অন্যত্র যাইয়া মলমূত্র পরিত্যাগ করিবারও সুযোগ ও শক্তি রহিল না। তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও ঘর্ম্মাক্ত হইল। তিনি নিরুপায় হইয়া হা হুতাশ করিতেছেন, এমত সময়ে খোদার প্রসাদাৎ তিনি হজরতের দৃষ্টিপথে পড়িলেন। দর্শনমাত্র সওদাগরের আভ্যন্তরিক পীড়া তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল এবং সেই অসহনীয় যন্ত্রণায় শান্তি প্রদানার্থ তৎক্ষণাৎ মিম্বর হইতে উঠিয়া আপনার অঙ্গাচ্ছাদনী খানি সওদাগরের শরীরে ফেলিয়া দিলেন। লীলাময় জগৎপাতার কি অত্যদ্ভুত অলৌকিক লীলা! সওদাগর সেই অঙ্গাচ্ছাদনী দ্বারা আবৃত হইয়া দেখেন যে, তিনি এক বিস্তীর্ণ নির্জ্জন প্রান্তর মধ্যে রহিয়াছেন, সম্মুখে নির্ম্মল-সলিলা নির্ঝরিণী, তত্তীরে বিবিধ বনপাদপশ্রেণী প্রকৃতির শোভা-বর্দ্ধন করিতেছে। অতঃপর সওদাগর আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া নিকটস্থ বৃক্ষশাখায় হস্তস্থিত তস্‌বি রাখিয়া শৌচ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন এবং নদী-প্রবাহে অঙ্গশুদ্ধি করিয়া তীরে উঠিতেই হজরতের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলেন। বিস্ময়-চমকিতচিত্তে চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখেন, কিছুই নাই। কোথায় বা নদী, কোথায় বা বৃক্ষ, আর কোথায় বা প্রান্তর। সকলই অদৃশ্য

বোধ হইতে লাগিল। ফলতঃ পুরীষ পরিত্যাগও তো মিথ্যা নহে! কিন্তু সে পুরীষ কোথায়? উপবেশন-স্থানে তাহার কোন চিহ্নও দেখিতে পাইলেন না। হাতের জপমালাই বা কোথায়? অনেক সন্ধানেও তাহার পুনঃ প্রাপ্তি হইল না। বহু চিন্তার পর এই অপূর্ব্ব ঘটনার মর্ম্মোদ্ভেদ করিতে অক্ষম হইয়া সওদাগর পুনরায় ধর্ম্মোপদেশ শুনিতে মনঃসংযোগ করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মকথার সাঙ্গ হইলে হজরত আপনার অঙ্গাচ্ছাদনী গ্রহণকালে সওদাগরকে কহিলেন, "কেমন, আর কোন ক্লেশ নাই তো?" সওদাগর সসম্মান অভিবাদন করিয়া উত্তর করিলেন যে, হজরতের কৃপাগুণে এক্ষণে আমি প্রকৃতিস্থ হইয়াছি; কোন উদ্বেগ নাই। কিন্তু আমার তসবি পাইতেছি না। পরে সওদাগর স্বীয় অভিলষিত স্থানে গমনার্থ যথোচিত সম্মান প্রদর্শনান্তর হজরতের নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। কি অত্যদ্ভুত ঘটনা! কি বিচিত্র ব্যাপার!! সওদাগর নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া কিছু দূর গমন করিতেই দেখেন, সম্মুখে সেই স্রোতস্বিনী সম্বলিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর; তটোপরি গুল্ম-লতাদি ও তরুরাজি শোভা পাইতেছে। কতিপয় পদ অগ্রসর হইতেই সেই পূর্ব্বদৃষ্ট পাদপ-শাখায় রক্ষিত তসবিও পাইলেন। সওদাগর এই অলৌকিক ঘটনায় একেবারে চমৎকার-রসে আপ্লুত হইলেন। বুঝিলেন, ধর্ম্মোপদেশক সামান্য মানব নহেন। তাঁহার ভক্তির উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি

অগৌণে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যাবতীয় সহগামী ব্যক্তিসহ সেই পবিত্র পুরুষের নিকট যথারীতি দীক্ষা লাভ করিলেন।

হজরত জিলানী স্বয়ং বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন যে, আমি যৌবনকালের প্রথম হইতে চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত কেবল সন্ধ্যাকালীন উপাসনার অজুতেই প্রত্যূষের উপাসনা সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছি। উল্লিখিত সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে কোন রজনীতেও তাঁহার অজু ভঙ্গের কোন বিঘ্ন উপস্থিত হয় নাই। অপরন্তু তিনি এরূপ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন যে, সন্ধ্যাকালীন উপাসনার পর এক পদে দণ্ডায়মান হইয়া পবিত্র কোরাণ শরিফ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত আবৃত্তি করিতেন। অতঃপর প্রাতঃকালের উপাসনা সাঙ্গ করিয়া পরমকারুণিক বিশ্বকর্ত্তার ধ্যানে এরূপ গভীরভাবে নিমগ্ন হইতেন যে, ক্রমাগত চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত তাঁহার স্নানাহার কিছুই ঘটিত না, কেবল অবিশ্রান্ত যোগ-সাধনেই নিমজ্জিত থাকিতেন।

এক সময়ে যখন মহর্ষি অরণ্য মধ্যে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন জনৈক অপরিচিত পুরুষ তাঁহার সম্মুখীন হইয়া বলেন যে, "আপনি কি কাহার বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষা রাখেন?" তৎশ্রবণে তিনি বলিলেন, "হাঁ, যদি কেহ আমার সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য অগ্রসর হন, তবে আমিও তাঁহাতে । স্থাপন করিতে প্রস্তুত আছি।" আগন্তুক ব্যক্তি এই কথা শুনিয়া বলিলেন, যদি তাহাই নিশ্চিত, তবে আমি যে পর্য্যন্ত না প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, আপনি এই স্থান হইতে কুত্রাপি

গমন করিবেন না।" আগন্তুক ইহা বলিয়া প্রস্থান করিলেন; হজরত জিলানীও তাঁহার বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। এই অবস্থায় দিনের পর দিন, সপ্তাহ, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া গেল, তথাপি আগন্তুকের দর্শন নাই। এক বৎসর গত হইলে পর, সেই ব্যক্তি পুনরাগত হইয়া হজরতকে বলিলেন, "আমি যতক্ষণ না ফিরিব, আপনি পুনঃ এই স্থানেই অপেক্ষা করুন, কোথাও যাইবেন না। আমি শীঘ্রই প্রত্যাগত হইয়া আপনার সঙ্গে আপনার ভবনে গমন করিব।" ইহা বলিয়া সেই অপরিচিত পুরুষ আবারও এক বৎসরের জন্য অদৃশ্য রহিলেন এবং অপার অধ্যবসায়শীল মহাতপা ঋষিরাজও সেই স্থানে সেই জনমানবশূন্য ভয়ঙ্কর অরণ্য-অভ্যন্তরে একাকী আগন্তুকের আগমন-আশায় পিপাসা-পীড়িত চাতকের ন্যায় চাহিয়া রহিলেন। এক বৎসর পরে আগন্তুক উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য সহ উপনীত হইয়া প্রফুল্লমুখে বলিলেন, "মহাত্মন্! আমি খেজর, দৈবাদেশে আপনার সহিত মিত্রতা স্থাপন ও আহার করিতে আসিয়াছি।" হজরত জিলানী এই বাক্য শুনিয়া মহাপুরুষ খেজরের যথোচিত সাদর সম্ভাষণ করিলেন; পরে উভয়ে একত্রে ভোজনক্রিয়া সম্পন্ন করত সায়ংকাল পর্য্যন্ত সদালাপে অতিবাহিত করেন। কথিত আছে, হজরত এই বৎসরত্রয় মহাটবী মধ্যে কেবল বিভু-নামামৃত পান ব্যতীত অপর দ্রব্য ভক্ষণ না করিয়া জীবিত ও দণ্ডায়মান ছিলেন। ধন্য তাঁহার সহিষ্ণুতা! ধন্য তাঁহার সাধন-বল!

তপস্বীপ্রবর একবার খোদার নামে শপথ করিয়া প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইয়াছিলেন যে, যদবধি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজ হস্তে তাঁহার মুখে আহার্য্য ও পানীয় তুলিয়া না দিবে, সে পর্য্যন্ত তিনি কোন-ক্রমেই পানাহার করিবেন না। ফলতঃ তদনুসারে নিরম্বু অনশনে চল্লিশ দিন অতীত হইয়া যায়, এমন সময়ে এক ব্যক্তি সুস্বাদু খাদ্যপূর্ণ থাল সমভিব্যাহারে তাঁহার সম্মুখে উপনীত হইয়া আহারার্থ আহ্বান করিলেন। সত্যব্রত ঋষিরাজ ক্ষুধার্ত্ত সত্বেও তৎপ্রতি ভ্রুক্ষেপও করিলেন না। কিন্তু তাঁহার রসনেন্দ্রিয়ের (নফ্‌সের) অভিলাষ উহা ভক্ষণ করে। তাহাতে তিনি রসনেন্দ্রিয়কে আপনার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করিয়া দিয়া শাসন করিলেন। নফ্‌স পুনঃ "ক্ষুধিত, ক্ষুধিত" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া খাদ্য প্রার্থী হইল। তিনি তাহাতেও কর্ণপাত করিলেন না।

ঘটনাক্রমে সেই স্থান দিয়া প্রসিদ্ধ তত্ত্বদর্শী পণ্ডিত মহাত্মা শেখ আবু সইদ মখদুমী গমন করিতেছিলেন। তিনি নফ্‌সের কাতরোক্তি শ্রবণে দণ্ডায়মান হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "এ কাহার করুণ ধ্বনি?" হজরত তদুত্তরে বলিলেন, "ইহা ক্ষুধার্ত্ত ইন্দ্রিয়ের প্রার্থনা। কিন্তু আমার আয়ত্ত আত্মা শান্তভাবে পরম পিতার মহিমা দর্শনসুখে নিমগ্ন আছে।" তখন শেখ সাহেব ঈষৎ হাসিয়া "আমার সঙ্গে আইস।" বলিয়া প্রস্থান করিলেন; কিন্তু হজরত উঠিলেন না। ইতিমধ্যে মহাত্মা খাজা খেজর দর্শন দিয়া তাঁহাকে শেখ সাহেবের গৃহে যাইবার

জন্য বলিলেন। তদনুসারে তিনি গাত্রোত্থান করিয়া বহির্গত হইলেন এবং যাইয়া দেখেন যে, সুধীপ্রবর শেখ সাহেব তাঁহার অপেক্ষায় দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। তাঁহাকে দর্শনমাত্র বলিলেন "প্রিয় আব্দুল কাদের! আমার বাক্য কি তোমার পক্ষে যথোপযুক্ত ছিল না যে,তাই তুমি খেজরের অনুজ্ঞা বিনা স্বস্থান ত্যাগ কর নাই?" ইহা বলিয়া তিনি হজরত জিলানীকে গৃহ-মধ্যে বসাইয়া অত্যধিক অনুগ্রহ ও যত্ন সহকারে স্বহস্তে তুলিয়া পরিতৃপ্তির সহিত আহার করাইলেন। অতঃপর আপনার খের্কা (জামা) উন্মোচন করত হজরতের বক্ষে বক্ষ লাগাইয়া আলিঙ্গন-পূর্ব্বক প্রসন্ন অন্তরে তাঁহাকে ধর্ম্মতত্ত্ব শিক্ষাদান এবং প্রধান শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন।

একদা পবিত্র রোজা-ব্রত উদ্‌যাপনের সময় ৭০ সত্তর ব্যক্তি পরস্পরের অজ্ঞাতসারে ঋষিসত্তমকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন এবং তিনিও প্রত্যেকের নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মতি দান করেন। অতঃপর যথাকালে সেই মাহাত্ম্যসাগর পবিত্র পুরুষ স্বীয় অলৌকিক শক্তিপ্রভাবে উক্ত সপ্ততি জনের বাটীতেই আহারান্তে উপাসনা কার্য্য সম্পন্ন করেন। পর দিবস নিমন্ত্রণকারিগণের সকলেই কথা প্রসঙ্গে "হজরত কল্য আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন," এইরূপ প্রকাশ করায় চতুর্দ্দিকে হুলস্থুল পড়িয়া যায়। বাস্তবিক এক ব্যক্তির একই সময়ে সপ্ততি জনের বাটীতে আহার ও নামাজ নির্ব্বাহ করা, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ও ঘোর বিস্ময়ের বিষয় আর কি হইতে পারে?

ফলতঃ বোগদাদবাসীরা তাঁহার এইরূপ অপার্থিব ক্রিয়াশীলতার পরিচয় বহুল বিদিত ছিলেন, সুতরাং সন্দেহের ছায়ামাত্রও কাহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। কিন্তু মহর্ষির জনৈক শিষ্যের মনে এতদ্বিষয়ে বড়ই সংশয় জন্মে। মহাতপা দৈব-প্রসাদাৎ উহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া শিষ্যের মনের ভাব জিজ্ঞাসা করিলেন। শিষ্য নতমস্তকে সমুদয় যথাযথ বিবৃত করিলে হজরত তদীয় সংশয় নিরসন মানসে কহিলেন, "একবার এই বৃক্ষের দিকে চাহিয়া দেখ দেখি।" সন্দেহাকুলিত শিষ্য মস্তকোত্তোলন করিয়া বিস্ফারিত চক্ষে যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত, মস্তিষ্ক বিঘূর্ণিত ও অন্তরাত্মা চমকিত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, সেই তপস্বিকুল-শিরোভূষণ, সমুজ্জ্বল সত্যপ্রভাবপূর্ণ পুরুষপ্রবর বৃক্ষের যাবতীয় পত্রে আসীন হইয়া ধ্যানমগ্ন আছেন। পাদপের কি নিম্ন, কি ঊর্দ্ধ শাখায়, কি মধ্যভাগে, কি পার্শ্বদেশে, সর্ব্ব স্থানের পল্লবেই সেই মোহনমূর্ত্তি বিরাজিত, সর্ব্বত্রই হজরত অধ্যাসীন। কি অপরূপ দৃশ্য! কি অলৌকিক ঘটনা!! কি অমানুষিক সামর্থ্য!!! শিষ্যের সন্দেহ তন্মুহূর্ত্তেই তিরোহিত হইল। অধিকন্তু হজরতের অলৌকিকত্বে অধিকতর আস্থাবান্ হইলেন এবং ভীতচিত্তে, কম্পিত কলেবরে সেই মহামহিম মহাগুরুর পদানত হইয়া করুণ-কাতরে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

গ্রীষ্মাতিশয্য প্রযুক্ত একদিন হজরত গৃহ-প্রাঙ্গণে বসিয়া সমবেত লোকদিগকে উপদেশ দান করিতেছিলেন। সেই

সময়ে একটী চিল পক্ষী তাঁহার সভামণ্ডপের উপরিভাগে নিয়ত উড্ডীয়মান হইয়া কর্কশ চীৎকার করিতে লাগিল। একে ভয়ানক গ্রীষ্ম, তাহাতে আবার চিলের চীৎকারের বিরাম নাই। হজরত স্বয়ং এবং শ্রোতৃবৃন্দ সকলেই যারপর নাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। চিল কিছুতেই স্থানান্তরে উড়িয়া গেল না, মস্তকোপরি চক্রাকারে উড়িয়া ক্রমাগত নীরস নিনাদ বর্ষণ করিতে লাগিল, দেখিয়া অবশেষে হজরত সেই দুর্ভাগ্য বিহঙ্গমের উপর অভিশাপ-অসি নিক্ষেপ করিলেন। তখনি দৈবানুমতি-ক্রমে পক্ষী ছিন্নমস্তকে ভূপতিত হইল এবং যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিয়া উল্লম্ফন করিতে লাগিল। তখন পক্ষীর দারুণ দুর্দ্দশা দর্শনে হজরতের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি অগৌণে গাত্রোত্থান করিয়া পক্ষীর দেহে তাহার ছিন্ন মস্তক সংযোগ করিয়া দিলেন এবং পবিত্র "বিস্‌মেল্লা করিমা" পাঠ করত পক্ষীর উপর ফুৎকার দিয়া কহিলেন,—"খোদার হুকুমে জীবিত হও।" কি আশ্চর্য্য ঘটনা! ভক্ত-মনোরঞ্জন ভুবনাধিপতির অনুগ্রহে চিল তৎক্ষণাৎ পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইল, এবং স্বীয় স্বাভাবিক চীৎকার করিতে করিতে আকাশমার্গে পলায়ন করিল।

তপস্বিকুলের অগ্রণী মহাত্মা হজরত জিলানী কোন সময়ে নদী-পুলিনে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি প্রবাহিণীর অশান্ত উর্ম্মিরাজির অনর্গল উত্থান-পতন নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, আর সেই সর্ব্বলীলামূলীভূত বিশ্বস্রষ্টার অপার মাহাত্ম্য স্মরণ

করিয়া কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে তাঁহার গুণকীর্ত্তন করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, নিকটস্থ পল্লী হইতে কয়েকটী মহিলা জল গ্রহণার্থ নদীতে আসিল। রমণীগণ সকলেই একে একে জল লইয়া প্রস্থান করিল; কেবল একটী বৃদ্ধা সর্ব্ব-পশ্চাতে থাকিয়া আর গৃহে গমন করিল না। সে আপন কলসী জলপূর্ণ করিয়া রাখিয়া দিয়া করুণকাতরে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিল। তাহার হৃদয়ভেদী গভীর আর্ত্তনাদে চতুর্দ্দিক্ কম্পিত হইয়া উঠিল! হজরত জিলানী বৃদ্ধার সেই হাহাকার-ধ্বনি শ্রবণে বিচলিত হইলেন; তাঁহার কোমল হৃদয় দয়ার্দ্র হইয়া গেল। তিনি জনৈক পল্লীবাসীকে আহ্বান করিয়া তাহার দুরবস্থার কারণ জিজ্ঞাসু হইয়া জানিলেন যে, বৃদ্ধার এক মাত্র পুত্র নদী-পারস্থিত একটী গ্রামে বিবাহ করিতে গমন করে। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই পুত্র বিবাহান্তে নব বধূ লইয়া আত্মীয় স্বজন সহ যখন এই নদী পার হইতেছিল, সেই সময়ে প্রবল ঝটিকায় তরঙ্গোত্থিত হইয়া যাবতীয় বরযাত্রী ও সাজসজ্জা সহ জলমগ্ন হয়। আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, এই শোচনীয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে; তদবধি এই বৃদ্ধা প্রতিদিন এই নদীতে জল লইতে আসে, আর প্রিয়তম পুত্রকে স্মরণ করিয়া এইরূপে অবসাদে কিয়ৎক্ষণ শোক প্রকাশ করিয়া গৃহে গমন করে।

হজরত মন্দভাগিনী বৃদ্ধার নিদারুণ দুঃখের কাহিনী শ্রবণ করিয়া যৎপরোনাস্তি অনুতপ্ত হইলেন। তাঁহার দয়ার সাগর

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তিনি লোক দ্বারা বৃদ্ধাকে রোদন করিতে নিষেধ করিয়া দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "শান্ত হও, অশ্রু সম্বরণ কর, আর অনুতাপ করিও না। সহ্যগুণে শোকের দমন করিয়া আল্লাকে স্মরণ কর। সেই বিশ্ববিধাতার অনুগ্রহে তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইতে পারে। হয়ত তুমি আপন পুত্রকে নব বধূ সহ পুনঃ প্রাপ্ত হইতে পার।" পবিত্র-পুরুষ এই প্রবোধবাক্য বলিয়া পাঠাইয়া প্রেমময়ের প্রেম-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিলেন,—কোন নিভৃত স্থানে উপবেশন করত নদী-নিমজ্জিত ব্যক্তিবর্গের পুনর্জীবন দান জন্য একাগ্রচিত্তে সেই পরাৎপরের প্রার্থনায় নিমগ্ন হইলেন। মোহান্ধ জগৎ! একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া দেখ, প্রেমের কি অপূর্ব্ব মহিমা! প্রেমিক হৃদয়ের কি অদ্ভুত আকর্ষণ!! ভক্তাবতার হজরত জিলানীর আহ্বানে প্রেমময়ের আসন টলিল! তিনি মুগ্ধ ও তুষ্ট হইলেন এবং ভক্তমনোরঞ্জনার্থ সঙ্কল্পারূঢ় হইলেন। ফলে সে সঙ্কল্প সিদ্ধ হইতে আর কতটুকু সময় লাগে? যেই সঙ্কল্প, সেই সিদ্ধি—কার্য্যে পরিণতি। কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইতে না হইতেই হজরতের তপঃপ্রভাবে, সেই অচিন্ত্যশক্তি ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় ও অনুজ্ঞায় বর-কন্যা, সহ-যাত্রী লোক ও সজ্জাদি সহ সেই নৌকা নদীগর্ভ হইতে উত্থিত হইয়া তীরসংলগ্ন হইল। কি অদ্ভুত কার্য্য! তাই পুনঃ বলিতেছি, প্রেমিকের শক্তি কি অসীম! সেই শক্তিপ্রভাবে জগতে এতাদৃশ কত অত্যদ্ভুত ও অচিন্তনীয় ঘটনা সমাহিত হইতে পারে, কে জানে? তত্ত্বজ্ঞানহীন, স্বল্পধী, সদা সন্দেহাকুল পাপী

মানবের তাহা দেখিয়া শুনিয়াও কি তলাইয়া বুঝিবার ক্ষমতা আছে ?

বৃদ্ধা অনেক কাঁদিয়াছে, অনেক অনুতাপ করিয়াছে, অনেক অযৌক্তিক প্রলাপোক্তির সহিত আপনাকে ধিক্কার দিয়াছে। এই দীর্ঘকাল তাহার রোদন, অনুতাপ ও অনুযোগের আর বিরাম ছিল না; কিন্তু আজ তাহার সকল দুঃখের শেষ হইল, সকল উদ্বেগের অবসান হইল। সর্ব্বমঙ্গলময় জগদীশ্বরের প্রসাদে আজ তাহার আনন্দের সীমা নাই; আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া আজ তাহার নয়নদ্বয় অশ্রুধারা বর্ষণ করিতেছে, হৃদয় নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। সে হজরতের তপশ্চর্য্যা ও জগৎ-পিতার অপার মহিমা যুগপৎ চিন্তা করিয়া বিস্মিত ও চমৎকার-রসে অভিষিক্ত হইয়া গেল। অবশেষে প্রফুল্লবদনে আল্লা-তালার ধন্যবাদ ও হজরতের গুণানুবাদ করিতে করিতে আপনাকে সৌভাগ্যবতী মানিয়া পুত্র ও পুত্রবধূ সহ গৃহে গমন করিল। এই অলৌকিক ঘটনার সংবাদ অবিলম্বে চতুর্দ্দিকে প্রচারিত হইল। কথিত আছে, অনেক পথভ্রান্ত লোক তৎ-শ্রবণে স্বেচ্ছায় হজরতের নিকটে আসিয়া শাস্ত্রসম্মত প্রথানুসারে সত্যধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। *

* এই ঘটনা এবং পূর্ব্বোল্লিখিত দুই একটী বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করিতে অনেকেই ইতস্ততঃ করিতে পারেন। করিবারই কথা, কেননা বহু পূর্ব্বে নিমজ্জিত নৌকার আবির্ভাব ও আরোহিগণের জীবনপ্রাপ্তি কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে। ইহা খোদার সৃষ্টি-পদ্ধতির বহির্ভূত কথা। তবে ঘটনাও যে একেবারে অমূলক, তাহা নহে। আমাদের বিশ্বাস, ইহার মূলে কোন আধ্যাত্মিক ব্যাপার আছে।

আর লিখিব কত ? লিখিবার সামার্থ্যই বা কোথায় ! হজরতের মাহাত্ম্য বিষয়ক এইরূপ অত্যদ্ভুত ঘটনা শত সহস্র বিদ্যমান রহিয়াছে, দিবারজনী অক্লান্ত পরিশ্রম করিলেও তাহার শতাংশের এক অংশও লিপিবদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। সে সমুদ্র অপার, অসীম ও অনন্ত। সুতরাং সেই মহিমার্ণবের মহিমা-বিশ্লেষণে আর অগ্রসর না হইয়া ক্ষুণ্ণ-মনে লেখনী সংযত করিতে বাধ্য না হইয়া আর কি করিব !!

তপস্বিকুলের অগ্রণী মহামহিম হজরত আবদুল কাদের জিলানী হিজরী ৫৬১ সালের ১১ই রবিওলআওল তারিখে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চিরস্থায়ী সুখরাজ্যে প্রস্থান করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার দশটী পুত্র এবং একটী কন্যা জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থায় কন্যাটীর পরলোক-প্রাপ্তি ঘটে। হজরত জীবনের প্রথম ১৮ বৎসর জন্মভূমি গিলানে অতিবাহিত করেন; তৎপরে ৭ বৎসর কাল বিদ্যাশিক্ষার্থ পবিত্র বোগদাদ নগরে বাস করিতে বাধ্য হন। পঁচিশ হইতে ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত ঋষিপ্রবর জগৎপিতার ধ্যানধারণায় নির্জ্জন-নিবাস করেন। অনন্তর ৪১ বৎসর হইতে মৃত্যুর শেষ দিন পর্য্যন্ত লোক-সাধারণের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হইয়াছিলেন, তাঁহার মুখ-কমল প্রফুল্ল ও সর্ব্বাঙ্গ স্বর্গীয় উজ্জ্বল প্রভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তিম সময়ে তিনি আপন পরিবারবর্গ, শিষ্যমণ্ডলী ও পরিচারকগণকে

একত্রিত করিয়া সদুপদেশ প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করেন। পরে সাময়িক নামাজ সমাপনান্তে লম্বিতভাবে শয়ন করিয়া পবিত্র বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে বোগদাদবাসীদিগকে শোকসাগরে ভাসাইয়া, জগৎ অন্ধকার করিয়া সেই পরমার্চ্চনীয় পবিত্র পুরুষ ইহলৌকিক মায়ার বন্ধন ছিন্ন করেন। বোগদাদের যে স্থানে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাধিস্থ করা হয়, তাহার নাম "মাদ্রাসা মায়াল্লা বাবল্ আজাজ্।" এই স্থান সেই পবিত্র দেহের সংস্পর্শে পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিণত হইয়া অসংখ্য যাত্রিক-হৃদয়ের ও তাহাদের নয়ন মনের সার্থকতা সম্পাদন করিতেছে।

২। নিজামউদ্দিন আউলিয়া

(জরিজার বখ্‌শ।)

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে পবিত্রাত্মা মহাপুরুষের নাম লিখিত হইল, তিনি এক জন পরমতত্ত্বজ্ঞ সাধু ব্যক্তি ছিলেন। "সোল্‌তান অল মশায়েখ" নামে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্‌গুণ ও সাধুতা প্রভাবে এক সময়ে দিল্লী ও তাহার চতুর্দ্দিক্‌স্থ স্থান সুরভিত, গৌরবান্বিত ও শ্রীসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। বহু দিবস হইল, সেই তাপস-প্রবর ইহলোক হইতে অন্তর্হিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মধুময় নাম শ্রবণে লোকে এখনও অবনতমস্তকে তৎপ্রতি ভক্তি ও

শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়া থাকেন এবং তাঁহার পবিত্র সমাধি দর্শন করিয়া আপনাদিগকে ধন্য মনে করেন।

সেই সাধু-প্রবর এতদ্দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আদি অধিবাস-ভূমি এদেশ নহে। তাঁহার পূজনীয় পিতামহ খাজে আলি বোখারী বোখারার অধিবাসী ছিলেন। বোখারা স্বাধীন তাতার, তুর্কস্থান বা তুরাণের অন্তর্গত একটী সমৃদ্ধিশালিনী নগরী, এই নগরী তৎকালে মুসলমান-গৌরবের অন্যতম কেন্দ্রভূমি ছিল। এখানে ইস্‌লামের সর্ব্বতোমুখী প্রভুতা স্মিতমুখে শুভ্র কিরণ বিতরণ করিত। ইহার বিদ্যোন্নতি ও শিল্পবাণিজ্যের তুলনা ছিল না। নগরী সুদৃশ্য সৌধাবলীসমাকীর্ণ; ইহাতে ৩৬০টী মস্‌জিদ এবং ততোধিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আজিও ইস্‌লামের প্রবল ধর্ম্মভাব ও বিদ্যানুরাগিতার উজ্জ্বল নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে। খাজে আলি বোখারী এই সুসভ্য জনপদের সম্ভ্রান্ত সৈয়দ বংশীয় শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। কিন্তু হইলে কি হইবে? তাঁহার আর্থিক অবস্থা অতি হীন ছিল; তিনি অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাই তিনি অবস্থার উৎকর্ষ বিধানমানসে—ভাগ্যাকাশে সুখ-সূর্য্যের অভ্যুদয় করণাভিপ্রায়ে সাধের জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া ধনধান্যপূর্ণ ভারতবর্ষে আসিতে সঙ্কল্প করেন।

এই সিদ্ধান্তানুসারে প্রবীণ খাজে সাহেব সর্ব্বদুঃখহারী, সুখ-বিধানকারী আল্লার নাম স্মরণপূর্ব্বক তরুণবয়স্ক পুত্র ও পরিবার সহ অবিলম্বে বোখারা হইতে বহির্গত হইলেন এবং

অতি কষ্টে পর্ব্বত-প্রান্তর, বনভূমি, নদনদী অতিক্রম করিয়া লাহোরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। লাহোরে কিয়দ্দিবস অবস্থান করিয়া দেখিলেন, তিনি যে উদ্দেশ্যে জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, এখানে থাকিলে তাহা সফল হইবার আশা আদৌ নাই। সুতরাং আবার তাঁহাকে বাধ্য হইয়া অন্যত্র গমনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। অনুসন্ধানে জানিলেন যে, বদায়ুন একটী জনপূর্ণ উন্নতিশীল নগর, তথায় গমন করিলে অর্থাগমের সুযোগ ঘটিতে পারে, ইহা বিবেচনাপূর্ব্বক তিনি সপরিবারে বদায়ুন যাত্রা করিলেন।

দিন চিরদিন সমান থাকে না। গভীর অমা-রজনীর পর ঊষার উজ্জ্বল আলোক অবশ্যই জগতের আনন্দবিধান করিয়া থাকে। যাঁহার অপূর্ব্ব অচিন্ত্য কৌশলে সংসার-চক্র প্রতিনিয়ত বিঘূর্ণিত হইতেছে, ইহা সেই করুণাময় বিধাতার কার্য্য। তিনি দাতা ও প্রার্থনা-পূর্ণকারী। যিনি সৎপথে থাকিয়া অভীষ্ট সিদ্ধির চেষ্টা করেন, তাঁহার অভাব-অনাটন ঘুচিয়া গিয়া স্বচ্ছলতা ও শুভাদৃষ্ট ঘটিয়া থাকে। বৃদ্ধ খাজে আলি বোখারী বদায়ুন নগরে আসিয়া একটী কার্য্য প্রাপ্ত হইলেন—তাঁহার কষ্টের অবসান হইল। তিনি কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পুত্র-কলত্র লইয়া সুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

খাজে সাহেবের সংসারের একমাত্র অবলম্বন প্রিয় পুত্র খাজে আহম্মদ দানিয়েল। খাজে আহম্মদ দানিয়েল শিষ্ট, শান্ত ও পিতৃ-অনুগত ছিলেন। বৃদ্ধ আলি বোখারী

প্রিয়তম পুত্রের শিক্ষার দিকে আশানুরূপ মনোযোগ দিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার জন্মভূমি বোখারা পরিত্যাগ করিয়া আসার পর ভারতে প্রায় সাত বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে দানিয়েল দ্বাবিংশতিবর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়াছেন। খাজে আলি ভাবিলেন, "আমার তো বার্দ্ধক্য-দশা, শরীরের সামর্থ্য ক্রমশঃ হীন হইয়া আসিতেছে। কোন্ দিন কি ঘটে, বলা যায় না। সুতরাং আমি জীবিত থাকিতে থাকিতে পুত্রের বিবাহকার্য্য নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য।" ইহা স্থির করিয়া তিনি অবিলম্বে এক সম্ভ্রান্ত সৈয়দ পরিবারের একটী সুলক্ষণা সুশীলা কন্যার সহিত পুত্রের পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

পুত্রের বিবাহ-কার্য্য সম্পাদন করিয়া খাজে আলি বোখারী নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু তিনি কিছু দিনের মধ্যেই যাবতীয় পার্থিব চিন্তার হস্ত হইতে চির অবসর গ্রহণ করিলেন। তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইল, তিনি প্রিয় পরিবার ও আত্মীয় বান্ধবদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া পরলোকযাত্রা করিলেন। তখন দানিয়েলের স্কন্ধে দুরূহ সংসার-বোঝা চাপিল, তিনি চক্ষে অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু কি করিবেন? তাঁহার সে বোঝা বহন করিবার এ জগতে তিনি ভিন্ন আর কে সহযোগী আছে? স্থিরধী দানিয়েল যদিও এই সময়ে বদায়ুনের কাজীর পদে আসীন ছিলেন, তথাপি পিতৃ-বিয়োগে চিন্তিত চিত্তে করুণাময় বিশ্বপতির উপর নির্ভর করিয়া স্নেহময়ী জননী ও সাধ্বী সতী সহধর্ম্মিণীর সহিত দিনপাত করিতে লাগিলেন।

এইরূপে কিয়দ্দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল ; যুবক দানিয়েল বুদ্ধিমতী মাতার সুশৃঙ্খলা হেতু ও প্রিয়ভাষিণী প্রেয়সীর প্রীতি-সম্ভাষণে এই জ্বালা যন্ত্রণাময় দুঃখের সংসারে সুখ-সন্তোষের সৌম্য মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী পূর্ণগর্ভা ; বৃদ্ধা জননী পৌত্র-মুখ দর্শন করিবেন বলিয়া পরমানন্দিতা ও আপনাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতে লাগিলেন। অনন্তর যথাকালে ৬৩৪ হিজরী সালে দানিয়েলের অন্দরমহল আলোকিত করিয়া এক পরমসুন্দর শিশু জন্মগ্রহণ করিলেন। পিতা, মাতা, পিতামহী এবং প্রতিবেশিবর্গ শিশুর কমনীয় কান্তি দর্শনে আনন্দিত হইলেন। এই মহান্ শিশুই পরিণামে হজরত খাজে নিজাম উদ্দীন আউলিয়া জরিজারি বখ্শ নামে অভিহিত হইয়া অলৌকিক সাধুতা ও গুণগ্রামের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

যে বৎসর নিজামউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন, দিল্লীর সম্রাট্ শমস্উদ্দীন আঁল্তমাস ও হিন্দুস্থানের অন্যতম সিদ্ধ পুরুষ কোতবউদ্দীন বখ্তিয়ার কাকী ঠিক সেই বৎসরই স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। তপস্বী কোতবউদ্দীন বখ্তিয়ার কাকী অলৌকিক তপোনিষ্ঠ ও ধর্ম্মবলে বলীয়ান্ ছিলেন। তাঁহার গম্ভীর তত্ত্বকথা ও অপূর্ব্ব ধ্যান-ধারণার বিষয় আলোচনা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয়-মন বিস্ময়-রসে প্লাবিত হইয়া থাকে। সেই দিন এক দিকে যেমন তাঁহার তিরোভাব, অপর দিকে তেমনি আবার ধর্ম্মবীর খাজে নিজামউদ্দীনের আবির্ভাব—সূর্য্যের অস্ত

গমন ও তৎপরেই শ্বেতরশ্মি শশধরের উদয়! সুতরাং ধরাতল যে তমসাবৃত হইবে, সে অবস্থা তখন ঘটে নাই। ফলতঃ ইহাও যে করুণাময় বিধাতার অপূর্ব্ব লীলা ও অপার অনুগ্রহ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নিজামউদ্দীন দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। মাতার আদরে এবং পিতামহীর ততোধিক যত্নে শিশুর লালন-পালন-কার্য্য সুচারুরূপেই হইতে লাগিল। কিন্তু এ স্নেহ—এ যত্ন তাঁহাকে অধিক দিন ভোগ করিতে হইল না। যখন তিনি পাঁচ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিলেন, সেই সময়ে তাঁহার পিতৃদেব খাজে আহম্মদ দানিয়েল ও স্নেহময়ী পিতামহী পরলোক গমন করিলেন—তিনি স্নেহ-মমতায় বঞ্চিত হইলেন। এইরূপ বঞ্চনা—এইরূপ অনাথ অবস্থা যে কেবল তাঁহারই ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাহা নহে; জগতের মহাপুরুষদিগের অনেকেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে, ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে তাহা উপলব্ধি হইয়া থাকে। ফলে ইহাও বিশ্বপাতার এক বিচিত্র লীলা! সে লীলা মানব-বুদ্ধির আয়ত্ত নহে।

এক্ষণে সংসারে নিজামের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে একমাত্র মাতা বিবি জৈলেখা ব্যতীত আর কেহই রহিলেন না। বিবি জেলেখা অতি বুদ্ধিমতী ও সুশীলা মহিলা ছিলেন। তিনি দুঃখের অবস্থাতেও প্রাণাধিক পুত্রকে সমধিক যত্নে প্রতিপালন এবং কৌশলের সহিত তাঁহার শিক্ষা সুচারুরূপে দিতে লাগিলেন। নিজামউদ্দীন অতি বুদ্ধিমান্ বালক ছিলেন,

তাঁহার স্মৃতিশক্তি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি বার বৎসর বয়সে পবিত্র কোরাণ ও হদিস শরিফ আয়ত্ত করিয়া আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করত শিক্ষিত-সমাজে খ্যাতি লাভ করিলেন, দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার নিকট শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার শিক্ষানুরাগ অতি প্রবল ছিল এবং তন্নিবন্ধন তিনি পূজনীয়া মাতার সহিত তদানীন্তন শিক্ষা, সভ্যতা, সদাচার ও সর্ব্ববিষয়িণী উন্নতির কেন্দ্রভূমি গৌরবময়ী দিল্লী নগরীতেও গমন ও অবস্থান করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। ফলতঃ এই শিক্ষানু-রাগের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগও অতীব প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক বলিয়া ধনীর প্রাসাদে ও দীনের কুটীরে পর্য্যন্ত সুপরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এই সময়ে দিল্লীতে কাজীর পদ শূন্য হয়। বাদশাহ জনৈক চরিত্রবান্, ন্যায়দর্শী, ধর্ম্মভীরু ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে এই দায়িত্ব-পূর্ণ পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করেন। তদনুসারে প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি নিজামউদ্দীনের উপর পতিত হয়। মন্ত্রী বাদশাহের নিকট নিজামউদ্দীনের কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহাকে দরবারে আনয়ন করিলেন; বাদশাহ তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় গ্রহণ-পূর্ব্বক হৃষ্টচিত্তে কাজীর পদ প্রদান করিলেন।

দিল্লীর কাজীর পদ-প্রাপ্তি—বিচার-বিভাগের উচ্চাসনে উপবেশন, বড় কম সৌভাগ্যের কথা নহে। দরিদ্র নিজাম-উদ্দীন বাদশাহ কর্ত্তৃক সেই সর্ব্বজন-স্পৃহনীয় পদে নিযুক্ত হইয়া অতীব আনন্দিত হইলেন এবং সর্ব্বশুভদাতা আল্লাহ-

তায়ালাকে মুক্তকণ্ঠে ধন্যবাদ দিয়া গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক সেই সুখের সংবাদ জননীর কর্ণগোচর করিলেন। পুত্রের সম্মান ও কুশল-কথা শ্রবণ করিলে কোন্ জননী না আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইয়া থাকেন? দুঃখিনী নিজাম-জননী বিবি জেলেখা পুত্রের উচ্চ পদলাভের কথা শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইলেন এবং ইহা বিধাতার অনুগ্রহ জানিয়া তাঁহার উদ্দেশে মস্তক নত করিয়া পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিন্তু এদিকে বিশ্ব-নিয়ন্তার অভিপ্রায় অন্যরূপ; তাই সহসা নিজামউদ্দীনের ভাগ্য-ফল অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। যাঁহার অমৃতোপম উপদেশে শত শত শোকী তাপীর তাপ বিদূরিত হইবে, যিনি অসংখ্য পথভ্রান্ত নরনারীকে পুণ্যের পথ দেখাইবেন, তিনি তুচ্ছ পার্থিব-পদে অভিষিক্ত হইয়া অজস্র সুখে মগ্ন থাকিবেন, ইহা বিধাতার অভিপ্রেত হইল না। তিনি সেই দিনই কোন কার্য্য বশতঃ তাপসকুলরত্ন হজরত খাজে কোতবউদ্দীনের পবিত্র সমাধির নিকট দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক জ্যোতির্ম্ময় দরবেশ আবির্ভূত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "হা হা নিজাম! তুমি নগণ্য কাজীর পদ প্রাপ্ত হইয়া আহ্লাদে আত্মহারা হইয়াছ! ছি ছি, তোমার কি ভ্রম! আমি ভাবিয়া-ছিলাম, তুমি ধর্ম্মজগতের অধিপতি হইয়া তত্ত্বোপদেশ-অস্ত্রা-ঘাতে কুক্রিয়ার মূলোচ্ছেদ করিবে, ধর্ম্মবীর নামে গৌরবান্বিত হইবে। কিন্তু হায় তোমার কি নীচ অভিরুচি!"

নিজামউদ্দীনের কর্ণে এই কথা প্রবেশমাত্র তিনি দরবেশের

দিকে নেত্রপাত করিলেন। কিন্তু কি অপূর্ব্ব ঘটনা! দরবেশ অদৃশ্য! নিজামের দর্শন-লোলুপ চক্ষু সহস্র যত্নেও আর তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। তখন তিনি নানা চিন্তার আশ্রয়ীভূত হইয়া পড়িলেন, অন্তরে ভয় ও বিস্ময়ের সঞ্চার হইল। ভাবিলেন, "কাজীর পদ সম্মানিত ও শ্রেষ্ঠ পদ বটে, কিন্তু এ পদে উপবেশন না করিতেই, দৈব প্রতিবন্ধক দেখিতেছি। সুতরাং এ পদ আর কোনক্রমেই গ্রহণীয় নহে।" এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক মাতাকে মনোভাব জ্ঞাপন করিলেন। সেই সরলা মহিলা পুত্রের কথা শুনিয়াই অবাক্, ক্ষোভে তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া গেল, অন্তর নৈরাশ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িল। আত্মীয়-বন্ধুগণ নিজামকে কত প্রকারে বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই প্রবোধ মানিলেন না,—অযাচিতরূপে প্রাপ্ত উচ্চ পদ পরিত্যাগ করিলেন। লোকে তাঁহার অপূর্ব্ব আচরণে অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কত কথা বলিতে লাগিলেন। কিন্তু নিজামের চিত্ত অবিচলিত—বিকারশূন্য। তিনি বদায়ুনে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ইহার কিছু দিন পরেই তাঁহার জননী পুণ্যবতী জেলেখা বিবি পরলোকগমন করেন।

মাতৃবিয়োগে নিজামউদ্দীন অন্তরে অতীব আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার সুখ-শান্তি তিরোহিত হইল। তিনি ম্রিয়মাণ ভাবে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে এক দিন আবুবকর কাওয়াল নামক এক ব্যক্তি নিজামউদ্দীনের নিকট উপস্থিত হন। তিনি দেশ ভ্রমণান্তে বদায়ুনে আসিয়া-

ছিলেন এবং নিজামের নিকট আপনার ভ্রমণকাহিনী বর্ণন-প্রসঙ্গে অযোধ্যাবাসী হজরত খাজা ফরিদউদ্দীন মস্‌উদ শকরগঞ্জের তপোমহিমা, ধ্যান-ধারণা, ও অপূর্ব্ব মাহাত্ম্যের কথা ওজস্বিনী ভাষায় বর্ণনা করিতেই নিজামউদ্দীনের অন্তর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল—প্রেম-ভক্তির কি এক অপূর্ব্ব অনমুমেয় শক্তি তাঁহাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। তিনি সেই মহাপুরুষের সন্দর্শন লাভ এবং তদুপদেশে পারলৌকিক শ্রেয়ঃ অর্জ্জন করণার্থ অধীর হইয়া পড়িলেন। শয়নে, স্বপনে, উঠিতে বসিতে সেই মহা-পুরুষের পবিত্র নাম জপ করিতে লাগিলেন। অবশেষে নিজাম জন্মভূমির মায়া-মমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই শুভ্রকর্ম্মা সাধু ফরিদউদ্দান শকরগঞ্জের দর্শন লাভার্থে বহির্গত হইলেন।

নিজাম একাকী পদব্রজে চলিতেছেন। মনে শান্তি নাই, হৃদয় উদাসীন, পথ অপরিচিত। লক্ষ্য কেবল সেই মহাপুরুষ—ক্ষণে ক্ষণে বক্তার সেই বর্ণনা স্মৃতি-ক্ষেত্রে উদিত হইতেছে এবং অধিকতর চঞ্চল-চরণে পথ অতিক্রম করিতেছেন। এইরূপে বহু কষ্টে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া, শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক অভিলষিত দেবের পবিত্র লীলানিকেতনে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহার মন প্রফুল্ল হইল, হৃদয়ের অবসাদ দূরে গেল। মলিন মুখে হাসির ক্ষীণ রেখা দেখা দিল। তিনি হস্তদ্বয় উচ্চ দিকে উঠাইয়া কাতর কণ্ঠে কহিলেন, “হে খোদাতালা! তুমি নিঃসহায়ের সহায়, দরিদ্রের আশ্রয়স্থান। তোমার কৃপায় আজ আমি এই দূর দেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। প্রভো, যেন আমার মনো-

ভিলাষ পূর্ণ হয়, বাঞ্ছিত ধন লাভে যেন আমি বঞ্চিত না হই, ইহাই এ দীনের কাতর প্রার্থনা।”

হজরত ফরিদউদ্দীন শকরগঞ্জ তৎকালে হিন্দুস্থানের ইস্‌লাম-ধর্ম্ম-জগতের রাজা। দিল্লীর স্বর্ণ-সিংহাসনাসীন প্রবল-প্রতাপ বাদশাহ হইতে আমির-ফকির সকলেই তাঁহার নাম শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত উচ্চারণ করিয়া মস্তক নত করিয়া থাকেন। তাঁহার আবাস্‌-স্থল—সাধন-কুটীর অতি ক্ষুদ্র ও আড়ম্বরবিহীন। ফলতঃ আধ্যাত্মিক জ্ঞানোন্মত্ত সাধু পুরুষদের কি বাহ্যাড়ম্বরের দিকে খেয়াল থাকে? কখনই নহে। যাহা হউক, খাজে নিজাম উদ্দীন কম্পিত কলেবরে ধীরপদে সেই পুণ্য-কুটীরের দিকে অগ্রসর হইলেন—মনে কত ভাব, কত ভয়, কত চিন্তা! কিন্তু কি শুভ মুহূর্ত্ত! কি মাঙ্গলিক মহামিলন! হজরত শেখ ফরিদউদ্দীন নির্ম্মলচিত্ত নিজামকে দর্শনমাত্র হৃষ্ট-চিত্তে একটী কবিতা উচ্চারণ করিলেন। সেই কবিতার মোহনীয় ভাব তীরের ন্যায় শকরগঞ্জের রসনা হইতে নিজামউদ্দীনের হৃদয়ের অন্তস্তল বিদ্ধ করিল। নিজাম মুগ্ধ—তন্ময় হইয়া গেলেন, তাঁহার অন্তরে কি যেন এক মধুর তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল—নয়নে কি এক বিশদ ভাব পরিদৃশ্য হইল। তিনি যথারীতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধুবরের চরণ চুম্বন করিলেন, তিনিও সহাস্যে নিজামের হস্ত ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলেন, নিজামের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। এই সময়ে নিজামউদ্দীন বিংশ বর্ষ বয়স অতিক্রম করিয়াছিলেন।

নিজাম হৃষ্টচিত্তে গুরুগৃহে অবস্থান করিয়া প্রকৃষ্টরূপে শিক্ষা-দীক্ষা লাভ করিতে লাগিলেন। একেই তিনি স্বভাবতঃ ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সুশিক্ষিত ছিলেন, তাহাতে আবার গুরুদত্ত শিক্ষা-দীক্ষায় তাঁহার সেই ধর্ম্মনিষ্ঠা অধিকতর উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিল—তাঁহার অন্তরাকাশ জ্ঞান-সবিতার কিরণ সম্পাতে আলোকিত ও মাধুর্য্যময় হইল। কিয়দ্দিবস গুরুগৃহে অবস্থানের পর গুরুদত্ত "খের্কা-খেলাফত" গ্রহণান্তর তাঁহার আদেশ লইয়া দিল্লীতে শুভাগমন করিলেন। কিন্তু মহাড়ম্বরময়ী, সম্পদ-গৌরবে উচ্ছ্বসিত রাজধানী দিল্লীতে অবস্থান করা তাঁহার ঘটিয়া উঠিল না, একদা কে যেন অদৃশ্যে থাকিয়া তাঁহাকে আদেশ করিলেন, "গেয়াসপুরে গমন কর।" তিনি সেই দৈব আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া গেয়াসপুরেই আপনার স্থায়ী বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিলেন। গেয়াসপুর দিল্লী হইতে তিন মাইল দূরে অবস্থিত।

গেয়াসপুরে সাধনকুটীরে নিজামউদ্দীন দিবারজনী ধ্যান-মগ্ন থাকিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। অচিরকাল মধ্যে তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা, সাধুতা ও সদাচারের প্রতিষ্ঠা চতুর্দ্দিকে পরি-ব্যাপ্ত হইল; বহু লোক তাঁহার ধর্ম্মালোচনা শ্রবণে ও উপদেশামৃত পানে জীবন সার্থক করণাভিপ্রায়ে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে তাপস-প্রবরের ও তাঁহার সহচর শিষ্যগণের অতিশয় খাদ্যাভাব ঘটিয়াছিল। তাঁহারা বার মাস রোজা-ব্রত পালন করিতেন; তাঁহাদের সেই রোজা একাদি-ক্রমে কতিপয় দিবস রাত্রিদিবায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল—দিবসে

নিরম্বু উপবাসের পর রাত্রিতেও তাঁহারা উপবাসী থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এক দিন, দুই দিন, তিন দিন, এমন কি চতুর্থ দিবসে সন্ধ্যা-সমাগমেও রোজা-ব্রত ভঙ্গের পর ভোজনার্থ কোনও দ্রব্য তাঁহাদের ভাগ্যে জুটিত না। কি ভয়ানক বিড়ম্বনা! কিন্তু তাহাতেও তাঁহারা বিকাররহিত! চিত্ত অনাবিল—অচঞ্চল!! নিয়ত খোদাতালার আরাধনা ব্যতীত অন্য দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য ছিল না।

একটী ধর্ম্মশীলা বৃদ্ধা মহিলা তাপসপ্রবরের আবাস-গৃহের নিকটে অবস্থান করিতেন। চরকায় সূতা প্রস্তুত করিয়া তৎ-বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাঁহার জীবিকা নির্ব্বাহিত হইত। একদা সেই পুণ্যবতী শুনিলেন যে, তপস্বী ও তৎশিষ্যগণ অনশনে কষ্টভোগ করিতেছেন। তখন সেই করুণ-হৃদয়া মহিলা দেড় সের ময়দা লইয়া গিয়া সাধকবরের চরণোপান্তে স্থাপনপূর্ব্বক গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করিলেন। রমণীর প্রার্থনা পূর্ণ হইল, নিজামউদ্দীন তাহা নিজের জন্য নহে, কিন্তু অভ্যাগত অতিথির জন্য স্বীয় প্রিয় সহচর শেখ কামালউদ্দীন ইয়াকুবকে রন্ধন করিতে আদেশ করিলেন। ময়দা যথাবিধি পাক হইতেছে, এমত সময়ে এক কম্বলাবৃত তেজস্বী দরবেশ উপস্থিত হইয়া উচ্চকণ্ঠে কহিলেন, "নিজামউদ্দীন! যে কোন খাদ্য-সামগ্রী থাকে, আনয়ন কর।" তিনি কহিলেন, "ক্ষণকাল অপেক্ষা করুন, খাদ্য পাক হইতেছে, রন্ধন হইলেই খাইবেন।" দর-বেশ কহিলেন, "না না, বিলম্ব সহ্য হইতেছে না, তুমি উঠ এবং

যেরূপ রন্ধন হইয়াছে, তদবস্থায় পাত্রসহ সমস্তই আমার নিকট আনয়ন কর।” নিজামউদ্দীন অবনতমস্তকে তাহাই করিলেন—অগ্নির উপর হইতে খাদ্যপূর্ণ হাঁড়া আনিয়া আগন্তুক দরবেশের সম্মুখে স্থাপন করিলেন। অমনি দরবেশ হাঁড়ীর মধ্য হইতে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত আহার্য্য বাহির করিয়া লইয়া অম্লানবদনে খাইতে লাগিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে তাঁহার হস্তে ও মুখে অণুমাত্রও তাপানুভূত হইল না। দরবেশ ইচ্ছানুযায়ী খাইয়া হাঁড়ী সজোরে ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন,—হাঁড়ী খণ্ড খণ্ড হইয়া চূর্ণ হইয়া গেল এবং অবশিষ্ট খাদ্য ছড়াইয়া পড়িল। অনন্তর দরবেশ গম্ভীর স্বরে কহিলেন, “নিজাম! আধ্যাত্মিকতত্ত্বরূপ মহারত্ন শেখ ফরিদের নিকট তুমি প্রাপ্ত হইয়াছ; আমি তোমার বহির্জগতের আবরণ (এফ্‌লাসের হাঁড়ী) ভগ্ন করিলাম, তুমি এক্ষণে অন্তর ও বাহির উভয়বিধ তত্ত্বরাজ্যের অধিপতি হইলে।”

এই বাক্য নিঃশেষিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহিমময় দরবেশ অদৃশ্য! আর কেহই শত যত্নেও তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না। মুহূর্ত্তে কি যেন এক অপূর্ব্ব মায়ার খেলা ঘটিয়া গেল। সকলেই অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া অনিমেষলোচনে চাহিয়া রহিলেন। ফলতঃ এই ঘটনার পর হইতেই মহর্ষি নিজাম-উদ্দীনের মহিমা-গৌরব,—সাধুতার উজ্জ্বল আলোক চতুর্দ্দিকে অধিকতর বিকীর্ণ হইয়া পড়িল, তাঁহার সমাদর ও সম্মানের সীমা রহিল না। প্রতিদিন দলে দলে তাঁহাকে সন্দর্শন, তাঁহার

উপদেশ শ্রবণ ও বিবিধ উপাদেয় সামগ্রীসম্ভারে তাঁহার কুটীর-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে লাগিল। নিয়ত লোকসমাগম হেতু গেয়াসপুর সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে একদা তাৎকালিক দিল্লীর সম্রাট্ মাজদ্দীন কায়কোবাদ বাদশাহ তথায় একটী অভিনব নগর স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ফলে স্বয়ং বাদশাহ, তাঁহার উজির ও আমির-ওমরাহগণ সর্ব্বদা গতিবিধি করায় সেই নিস্তব্ধ পুরী শীঘ্রই কোলাহলপূর্ণ হইল।

তাপস-প্রবরের সাধন-কুটীরে বহু শিষ্য ও বিদ্বান্ লোক নিয়ত অবস্থিতি করিতেন। তদ্ভিন্ন অসংখ্য দরিদ্র ও অক্ষম ব্যক্তি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এই সকল লোকের আহারাদির জন্য তিনি নিত্য যে সকল উপঢৌকন পাইতেন, তদ্ব্যতীত তাঁহার প্রতিদিন প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হইত। কথিত আছে, যে প্রত্যহ দশটী উষ্ট্রের পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া খাদ্য-সামগ্রী আনিতে হইত। ফকির নিজামউদ্দীন এ ব্যয় কোথা হইতে করেন? কোথায় এত অর্থ পান? দিল্লীশ্বর মবারক খিলজীর একদা তদ্বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে। মবারক অতি নিষ্ঠুর ও নীচ-প্রকৃতির ঘৃণিত ব্যক্তি ছিলেন; ধর্ম্মভাব তাঁহার হৃদয়ে ছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইতিহাসে তাঁহার কলঙ্ককাহিনী বর্ণিত আছে। তিনি রাজ্য নিষ্কণ্টক করণাভিপ্রায়ে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খেজের খাঁন ও সাদী খাঁনকে নিহত করিয়াছিলেন; এই নিহত ভ্রাতৃদ্বয় তাপসপ্রবরের শিষ্য ছিলেন। সেই সূত্রে তাঁহাদের পূজনীয় গুরুর প্রতিও তাঁহার বিজাতীয় কোপ জন্মে। কিন্তু

প্রকাশ্যে তৎপ্রতি অণুমাত্রও অত্যাচার করিবার যো ছিল না, কেননা সভাসদ্‌বর্গ ও সৈন্যগণ সকলেই মহর্ষির ভক্ত শিষ্য। যদি কিছু করেন, তবে হিতে বিপরীত ঘটিতে পারে, বিবেচনায় চতুর মবারক ছলান্বেষণ করিতে থাকেন। অবশেষ জানিতে পারেন যে, তাঁহার সভাসদ্‌ ও সৈন্যগণই তাপস-রাজের এই ব্যয়-ভার বহন করিয়া থাকে। মবারক ইহা শুনিয়া ক্রোধে অগ্নিবৎ হইলেন এবং হুকুম প্রচার করিলেন যে, আজ হইতে যে কেহ ফকির নিজামউদ্দীনের নিকট যাইবেন বা উপঢৌকন ও অর্থাদি দিবেন, রাজকোষ হইতে তাঁহার বেতন বন্ধ করা যাইবে। সকলে এ আদেশ শুনিয়া অবাক্‌ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দুর্ম্মতি মবারকের পরিণাম চিন্তা করিতে লাগিলেন। ফলতঃ মূর্খ মবারক ভাবিয়াছিলেন যে, এতদ্দ্বারা তাপসকে না জানি কত কষ্ট ও কত অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু পাপমতি জানে না যে, যাঁহারা জগৎস্রষ্টার প্রিয়সুত, নির্ম্মল-চরিত, নিয়ত তপশ্চারণে নিরত, সেই সৎকর্ম্মশীল সাধুদিগকে কি কোন দুর্ম্মতি মানব কষ্টে পাতিত করিতে পারে? কোন-ক্রমেই নহে। মহর্ষি যথাসময়ে ঘৃণিত মবারকের ধৃষ্টতার সংবাদ শ্রবণে ঈষৎ হাস্য করিলেন এবং স্বীয় প্রিয় সেবক খাজে এক্‌বালকে কহিলেন, "আজ হইতে দৈনিক ব্যয় জন্য যে অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা তুমি মঙ্গলময় খোদা-তালার নামোচ্চারণপূর্ব্বক এই তাক হইতে গ্রহণ করিও।" এক্‌বাল তাহাই করিতে লাগিলেন। কি অলৌকিক ঘটনা!

তপস্বীর তপোমাহাত্ম্যে দৈবানুগ্রহে দৈনন্দিন ব্যয়ের অর্থ সেই তাক হইতে নির্ব্বাহিত হইতে লাগিল। অর্ব্বাচীন মবারক তৎশ্রবণে মৌন ও বিষণ্ণ হইলেন।

একদা সুলতান আলাউদ্দীন খিল্‌জী তাপসবরকে প্রাসাদে আনয়ন করন মানসে এক ব্যক্তিকে এইরূপ সংবাদ দিয়া প্রেরণ করিলেন যে, "আলেক খাঁনকে বহুসংখ্যক সৈন্য দিয়া যুদ্ধে প্রেরণ করা হইয়াছে। কিন্তু অদ্যাবধি তাঁহার কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই, তাঁহার সাহায্যার্থ পুনঃ সৈন্য পাঠাইব কি না, তাহা ভাবিয়া আমি অতীব ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। এই সময়ে কিছুক্ষণের জন্যও যদি আপনি মদীয় ভবনে পদার্পণ করেন, তবে আমার চিত্তের শান্তি ও সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল সাধিত হইতে পারে।" সাধুবর বাদশাহের ইচ্ছা অবগত হইয়া কিছুক্ষণ মুদিতনেত্রে চিন্তা করিয়া কহিলেন, "সুলতানকে বলিও, আমার বাদশাহ-দরবারে যাইবার কোনও প্রয়োজন নাই এবং সুলতানের চিন্তা করিবারও কোন কারণ নাই। আলেক খাঁন বিধাতার অনুগ্রহে বিজয়-যশোমাল্য পরিধান করিয়াছেন, এবং শীঘ্রই সসৈন্যে প্রত্যাগমন করিবেন; কল্যই এ শুভ সংবাদ তিনি প্রাপ্ত হইবেন।" আলাউদ্দীন এই আনন্দজনক কথা শ্রবণে অতীব হৃষ্ট হইলেন এবং সঙ্কল্প করিলেন, যে মুহূর্ত্তে এই সুসমাচার আমার নিকট পৌঁছিবে, আমি তৎক্ষণাৎ পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা তাপসবরকে উপঢৌকন প্রেরণ করিব। ফলতঃ সাধুদিগের কথা ব্যর্থ হইবার নহে। প্রকৃতই পর দিবস যুদ্ধজয়

সংবাদ বাদশাহের গোচরীভূত হইল, তিনি সানন্দচিত্তে তাঁহার সাধুতার প্রশংসাকীর্ত্তন করিয়া আপনার প্রতিজ্ঞা পালন করিলেন—পাঁচ শত স্বর্ণমুদ্রা তাপসপ্রবরের নিকট প্রেরিত হইল। যখন বাদশাহের লোক মুদ্রা লইয়া পৌঁছিলেন, সেই সময়ে ইস্‌ফেন্দিয়ার নামক জনৈক দরবেশ তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি পাত্রপূর্ণ স্বর্ণমুদ্রা দেখিবামাত্র হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক অর্দ্ধেক আপনার দিকে টানিয়া লইয়া কহিলেন, "ইহা আমাকে দান করুন।" বিষয়-বাসনা-নির্লিপ্ত তপস্বী নিজামউদ্দীন কহিলেন, "অর্দ্ধেক কেন ? তুমি সমস্তই গ্রহণ কর।" ইহা বলিয়া তাঁহাকে সমস্ত মুদ্রাই প্রদান করিলেন। এই ঘটনা হইতে তপস্বী নিজামউদ্দীন সাধারণ্যে জরিজার বখ্‌শ নামে আখ্যাত হইয়াছেন।

একদা এক জায়গীরদারের গৃহ অগ্ন্যুৎপাতে জ্বলিয়া যায় এবং তৎসহ তাঁহার জায়গীরের "ফরমান"ও ভস্মে পরিণত হয়। তিনি রাজধানী দিল্লীতে আসিয়া বাদশাহ-দরবার হইতে ফরমান পুনর্ব্বার হস্তগত করেন। কিন্তু প্রত্যাগমনকালে পথিমধ্যে তাহা হারাইয়া ফেলেন। যখন জানিতে পারিলেন যে, ফরমান নাই, তাহা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, তখন তাঁহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, তিনি হাহাকার করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন এবং সন্তপ্তচিত্তে ব্যগ্রভাবে অনুসন্ধানে রত হইলেন। কিন্তু কোথাও না পাইয়া অবশেষে হতাশহৃদয়ে খাজে নিজামউদ্দীনের সমীপে উপস্থিত হইয়া আপনার দুঃখের কথা কহিলেন। তাপসরাজ সহাস্যে আগন্তুক ব্যক্তিকে কহিলেন, "যদি তুমি ফরমান প্রাপ্ত

হও, তবে হজরত ফরিদউদ্দীন শকরগঞ্জকে কিছু 'নজর' দিবে কি না ?" তিনি কহিলেন, "যদি সেইরূপ সৌভাগ্যই হয়, তবে নিশ্চিতই নজর দিব।" তখন সাধুবর তাঁহাকে অভয় দিয়া কহিলেন, "যাও, এখনি কিছু হালুয়া খরিদ করিয়া লইয়া আইস।" তিনি তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া নিকটস্থ দোকানে হালুয়া ক্রয় করিলেন। দোকানদার হালুয়া ওজন করত এক খণ্ড কাগজ টানিয়া লইয়া তাহাতে বাঁধিতে লাগিল। ক্রেতা সেই কাগজের উপর দৃষ্টিপাত করিয়াই বুঝিলেন, ইহা যে তাঁহারই ফরমান! তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং ইহা যে ধর্ম্মাত্মা নিজামউদ্দীনের অলৌকিক মহিমার কার্য্য, তাহা অনুভব করিলেন। অতঃপর ব্যস্ততার সহিত সেই ফরমান ও হালুয়া গ্রহণান্তর দ্রুতপদে আসিয়া সাধুবরের পদপ্রান্তে অর্পণ করিলেন এবং আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছে, বলিয়া ভক্তিভরে হর্ষোৎফুল্ল-মুখে তাঁহার শিষ্যত্বে দীক্ষিত হইলেন।

তাপস-প্রবরের এইরূপ মাহাত্ম্য-প্রকাশক অনেক ঘটনা আছে। ফলতঃ তিনি যে এক জন অলৌকিক গুণগ্রামসম্পন্ন অদ্বিতীয় সাধক ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তিনি আজন্ম বিশুদ্ধচরিত্র ছিলেন। কিন্তু সাধারণ লোকের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, "সেই তত্ত্বদর্শী সুধী পুরুষ প্রথম জীবনে দস্যু ছিলেন।" পরন্তু সে কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা, আমরা যে কয়খানি উর্দ্দু গ্রন্থাবলম্বনে তাঁহার চরিতাখ্যান লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহাতে এ কথার লেশমাত্র নাই। তবে কেন যে সেই

পুরুষের প্রতি অযথা এই দুর্নাম আরোপিত হইয়াছে, তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। তিনি বিবাহ করেন নাই, এবং অতি দীর্ঘজীবী ছিলেন। ৯৪ বৎসর বয়সে সেই পুণ্য পুরুষের পবিত্র জীবনের অবসান হয়। তাঁহার মৃত্যুর তারিখ ৭২৫ হিজরী, রবিয়ল আখের ১৭ই, বুধবার। * এই দীর্ঘকাল তিনি আধ্যাত্মিক ধ্যানধারণা ও বাহ্য ধর্ম্মানুষ্ঠান সাধনেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। পরলোকগমনের দিন তাপসরাজ আপনার ভাণ্ডারে যে খাদ্যসম্ভার ও অর্থাদি ছিল, সমস্তই দীনদুঃখীদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন এবং স্বীয় শিষ্যদিগকে খের্কা-খেলাফতাদি দানে তুষ্ট করিয়া নামাজ পাঠান্তে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়েন। তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে শেখ নসিরদ্দীন মহমুদ দিল্লী-জ্যোতিঃ (চেরাগ-দিল্লী) মওলানা ফখরউদ্দীন, খাজে করিমউদ্দীন সমকন্দী প্রভৃতি বহু বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তি ছিলেন। গেয়াসপুরে তাঁহার পবিত্র সমাধি-সৌধ বিদ্যমান থাকিয়া তীর্থভূমিরূপে পরিণত হইয়াছে। সমাধি-প্রাচীর-গাত্রে একটী কবিতায় তাঁহার স্বর্গারোহণের তারিখ ও অপর বৃত্তান্ত প্রকটিত আছে।

* কিন্তু তাজকেরাতল আসেকিন ও সয়ের উল আস্‌ফিয়া নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বয়স ৯১ বৎসর হইয়াছিল বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

৩। এমাম জাফর সাদেক।

প্রেরিত পুরুষ-বংশধর মহাত্মা এমাম জাফর সাদেক আউলিয়া সমুহের মধ্যে অকলঙ্ক শশধর সদৃশ জ্যোতিষ্মান্ ছিলেন। তিনি বিদ্যা-বিশারদ, অতুল্য শাস্ত্রপারদর্শী, গভীর তত্ত্বজ্ঞ ও প্রতিভাসম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। তাঁহার তপোনিষ্ঠা, খোদাপ্রীতি ও প্রেম-ভক্তির বিষয় আলোচনা করিতে করিতে হৃদয় বিস্ময়-রসে অভিষিক্ত ও সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। তপস্বিকুলে সেরূপ ন্যায়-নিষ্ঠাবান্ সম্মানিত সাধক অতি অল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

আরববাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মহর্ষি জাফরের প্রতি বড়ই অনুরক্ত ছিলেন; সকলেই তাঁহাকে আন্তরিক ভক্তি, ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার প্রাধান্য ও সম্মাননা এতই বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, তাহাতে রাজ্যাধিপতিরও খ্যাতি-প্রতিপত্তি হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য অথবা অন্য কোন কারণে, একদা তদানীন্তন খলিফা মনস্থর হিংসা-প্রণোদিত হইয়া জাফরের প্রাণ-সংহার করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। তদনুসারে তিনি এক দিন আপন অমাত্যকে কহেন, "আমি জাফরের বধ-সাধন করিতে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। তুমি তাহাকে অনতি-বিলম্বে আমার সম্মুখে আনয়ন কর।" মন্ত্রী এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে বিস্ময়-চমকিত চিত্তে কহিলেন, "কোন্ অপরাধে

তাঁহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিতে চাহেন? যিনি জগৎপিতার ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন হইয়া নিয়ত নির্জ্জন নিবাস করিতেছেন, পার্থিব সুখ-সম্ভোগ ও বিষয়-বিভবের প্রতি যাঁহার ভ্রমেও দৃক্‌-পাত নাই, এবং যিনি হৃদয়-মন-দেহ পরমপিতার পথেই উৎসৃষ্ট করিয়াছেন, তাঁহার উপর ঈদৃশ কঠোরাদেশ কি প্রযুজ্য হইতে পারে?" মন্ত্রীর এই বাক্য খলিফার মর্ম্মস্পর্শ করিল না, অধিকন্তু তিনি মন্ত্রীকে ভয় প্রদর্শন করিয়া কহিলেন, "কোনও উপদেশ, কোনও প্রতিবন্ধক শুনিতে চাহি না, সত্বর আমার আদেশ পালন কর।" বারংবার বারণ সত্ত্বেও যখন খলিফা ক্ষান্ত হইলেন না দেখিলেন, তখন ধর্ম্মভীরু মন্ত্রী ক্ষুণ্ণমনে জাফ-রের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন।

এদিকে খলিফা মনসুর এক সশস্ত্র ভৃত্যকে এই আদেশ করিলেন "তপস্বী জাফর সাদেক আমার সম্মুখে আনীত হইলে আমি তাঁহার সম্মান জন্য যখন মস্তক হইতে উষ্ণীষ নামাইয়া লইব, তখনই তুমি অসি-প্রহারে তদীয় দেহ মস্তক-শূন্য করিবে।" অনন্তর মন্ত্রী সমভিব্যাহারে মহাতপা জাফর সাদেক রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দর্শনমাত্র ক্রূরমতি খলিফা সসম্ভ্রমে দণ্ডায়-মান হইয়া তাঁহার সম্মুখীন হইলেন এবং যথোচিত বিনয়নম্র-বচনে সম্ভাষণ করিয়া ভক্তিভরে সিংহাসনে উপবেশন করাই-লেন; স্বয়ং আজ্ঞাবহ দাসের ন্যায় নতমুখে তদীয় পুরোভাগে বসিলেন। কি ঘোর পরিবর্ত্তন!! অনিষ্টকামনায় যে হৃদয় কিছুক্ষণ অগ্রে কঠিন কুলিশোপম দৃঢ় হইয়াছিল, পরক্ষণেই

তাহা কোমল কুসুমবৎ ভাব ধারণ করিল। নিয়োজিত ঘাতক খলিফার মানসিক গতির পরিবর্ত্তন—অভ্যাগতের প্রতি তাঁহার সদয় ব্যবহার দেখিয়া বড়ই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিল। খলিফা জাফরকে কহিলেন, "এ অকিঞ্চনের প্রতি কি আপনার কোন কার্য্যের আদেশ আছে? যদি থাকে আজ্ঞা করুন, আমি প্রাণপণে তাহা প্রতিপালন করিব।" মহর্ষি তদুত্তরে বলিলেন, "প্রার্থনা, আর কখন আমাকে এখানে আহ্বান করিবেন না, অবিলম্বে বিদায় দিউন, তপস্যার ক্ষতি হইতেছে।" ইহা শুনিয়া খলিফা মনসুর স্মিত বদনে পূর্ব্ববৎ সম্ভ্রমের সহিত ঋষিরাজকে বিদায় প্রদান করিলেন। কিন্তু কি ভীষণ সঙ্কট উপস্থিত! তাপস-প্রবরের প্রস্থানের পর মুহূর্ত্তেই খলিফার সর্ব্বাঙ্গ থর থর কাঁপিতে লাগিল, উপবেশনশক্তি তিরোহিত হইল। তিনি তিন দিবস অচৈতন্যাবস্থায় পড়িয়া রহিলেন। মতান্তরে কহে, তিন দিবস নহে, অচৈতন্য থাকায় তিনি তিন সময়ের নামাজ সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, বহু সেবা-শুশ্রূষার পর খলিফা পুনঃ চৈতন্য লাভ করিলেন। সুস্থ হইলে মন্ত্রী এই দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি কহিলেন, "যে সময়ে তাপসপ্রবর দরবার-গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন, তৎকালে দেখিলাম, তাঁহার পাশে পাশে একটী বিষম বিষাকর বৃহৎ ভুজঙ্গম আসিতেছে। সেই সর্প স্বীয় বিস্তৃত ফণা আস্ফালন ও মুখব্যাদান করিয়া গভীর গর্জ্জনে কহিল, "যদি তুমি নিরপরাধ এমাম জাফর সাদেককে পীড়ন কর, নিঃসন্দেহ তোমাকে গ্রাস করিয়া

ফেলিব"।" ইহা শুনিয়া ভয়ে আমার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল ; আমি সর্পকে কি যে বলিয়াছিলাম, স্মরণ নাই। তবে তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, মনে আছে। অনন্তর বিষম ভয়ার্ত্ত হইয়া অচেতন ও কম্পিত কলেবরে ভূপতিত হই।" ইহা বিবৃত করিয়া খলিফা কাতরকণ্ঠে বলিলেন "মন্ত্রিন্! তোমার বাক্য না শুনিয়া এক জন পরমপবিত্র তপস্বীর তপোবিঘ্নোৎপাদন করিয়াছি ; অদৃষ্টে কি যে ঘটিবে, বলা যায় না।" জ্ঞানবৃদ্ধ মন্ত্রী খলিফাকে সান্ত্বনা করিলেন।

কোন সময়ে দাউদ তায়ী নামধেয় এক মহাত্মা মহর্ষি জাফরের সম্মুখীন হইয়া যথাবিহিত সম্ভাষণপূর্ব্বক বিনয়-নম্র-বচনে বলেন, "হে ইস্‌লাম-ধর্ম্মগুরু-বংশধর! আপনি আমাকে সদুপদেশ প্রদান করুন। আমার অন্তঃকরণ পাপ-কালিমায় মসীর বর্ণ ধারণ করিয়াছে।" তৎশ্রবণে অমায়িক-হৃদয় জাফর সাদেক উত্তর করিলেন, "হে আবু সোলেমান! বর্ত্তমান সময়ে তুমি স্বয়ং এক জন সাধক পুরুষ, আমার উপদেশ তোমার কি উপকারে আসিবে?" দাউদ বলিলেন, "আপনি জগন্মান্য হজরত মহাম্মদ মস্তফার বংশের উজ্জ্বল রত্ন ; আপনার গুণ-গরিমা ও প্রভুত্ব সকলেরই শিরোধার্য্য। সুতরাং উপদেশ প্রদান করা আপনার পক্ষেই ত সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।" তখন জাফর বলিলেন "হে মনস্বিন্! আমার ভয় হইতেছে, শেষ বিচারের দিনে পাছে আমার প্রতি প্রশ্ন হয় যে, তুমি পবিত্র শরামুযায়ী যাবতীয় ধর্ম্মকার্য্য পালন ও সত্যের অধীনতা গ্রহণ

কর নাই কেন? জানিও, উপদেশ বংশবিশেষে সীমাবদ্ধ নহে, চরিত্রই যথার্থ উপদেষ্টা।" এই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শুনিয়া দাউদ তায়ীর যুগলনেত্রে বাষ্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি করুণকাতরে বলিয়া উঠিলেন, "হে জগৎপতে! যিনি মহান্-চরিত্র, প্রেরিতপুরুষের বংশ-পরম্পরায় মহত্ত্বরসে যাঁহার জীবন-তরু সংবর্দ্ধিত, স্বয়ং ধর্ম্মগুরু যাঁহার প্রপিতামহের মাতামহ, এবং পুণ্যশীলা ফাতেমা যাঁহার গর্ভধারিণী, সেই ব্যক্তিই যখন এতাদৃশ সন্দিগ্ধচিত্তে কষ্টে কালক্ষেপ করিতেছেন, তখন নগণ্য তুচ্ছ দাউদের গৌরব করিবার কি আছে? হায় কোন্ গণনায় সে গণ্য হইবার যোগ্য?"

এক সময়ে মহর্ষি জাফর জগৎপিতার ধ্যান-ধারণায় নির্জ্জন নিবাস করিয়াছিলেন। তিনি নিয়ত নির্জ্জনে নিরাময় নিখিল-নাথের উপাসনায় নিমগ্ন থাকিতেন, কিছুতেই গৃহবহির্ভূত হইতেন না। এইরূপে বহু দিন গত হইয়া যায়। ইতি মধ্যে এক দিন তপস্বী সুফিয়ান সুরী তাঁহার সমীপস্থ হইয়া বলেন, "হে মহাপুরুষের বংশোদ্ভব! বর্ত্তমান সময়ে আপনি এক জন মহামনস্বী সাধু ব্যক্তি। আপনার সহবাস সকলেরই প্রার্থনীয়। আপনার উপদেশালোকে মনের তিমির দূরীভূত হইয়া সাধারণের উপকার হইতে পারে। কিন্তু দেখিতেছি, সে আশায় সকলে বঞ্চিত হইয়াছে। আহা, আপনার সুখসংসর্গ যখন এত ফলপ্রদ, তখন আপনি কি জন্য একাকী নির্জ্জনে অবস্থান করিতেছেন?" এতদুত্তরে তপস্বী বলিলেন, "আমি ইচ্ছা করিয়াছি, এক্ষণে গৃহত্যাগ করিয়া

কুত্রাপি যাইব না। কেননা দুঃসময়ে একাকী বিশ্রাম করাই উত্তম। সংসার-কোলাহলে লোক আপনার বাহ্য চিন্তায় মগ্ন আছে, পরস্পর প্রণয়ালাপ করিতেছে। কিন্তু অন্তর্দৃষ্টি ও অন্তশ্চক্ষু সকলেরই মুদ্রিত ও অন্তঃকর্ণ বধির রহিয়াছে।” ইহাই বলিয়া নীরব হইলেন; আগন্তুক মহাত্মাও নীরবে প্রস্থান করিলেন।

একদা কোন ধনীর একটী মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া অপহৃত হয়। জাফর সেই থলিয়া অপহরণ করিয়াছেন, এই অনুমানে সে দ্রুত যাইয়া তাঁহার হস্ত ধারণ করে। কিন্তু তাহার জানা ছিল না যে, তিনিই মহর্ষি জাফর সাদেক। যাহা হউক, সাধুপ্রবর তাহার আচরণে বিশেষ লজ্জিত হইয়া বলিলেন, “তোমার থলিয়াতে কত টাকা ছিল?” সে কহিল, “হাজার টাকা” তখন সরল-চেতা সাধু পুরুষ স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষার্থ তাহাকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া সহস্র মুদ্রা প্রদান করিলেন। সে হৃত দ্রব্য পুনর্হস্তগত হইল ভাবিয়া আনন্দে গৃহে প্রস্থান করিল। কিন্তু বিধাতার কি অপূর্ব্ব খেলা দেখুন। তাঁহার ভক্তের মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা হয়, প্রণিধান করুন। দৈবযোগে তাহার অপহৃত মুদ্রা-থলি স্থলান্তরে পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিল। এই ঘটনায় তাহার অন্তর বিচলিত হইল;—এক জন নিরপরাধ ভদ্র লোকের প্রতি দোষারোপ করিয়া উৎপীড়ন করিয়াছি, বলিয়া অনুতপ্ত হইল। এই ত্রুটির প্রতীকার মানসে সে অবিলম্বে সেই সহস্র মুদ্রা লইয়া মহাত্মা জাফরের নিকট গমন করিল এবং বিনয়নম্রবচনে কহিল,

"মহাশয়! আমার ভয়ানক ভ্রম হইয়াছে; অজ্ঞাতে যে অপরাধ করিয়াছি, কৃপা করিয়া তাহা মার্জ্জনা করুন। যে স্থানে মুদ্রা রাখিয়াছিলাম, তাহা আমার স্মরণ ছিল না; এক্ষণে ঐ টাকা আমি প্রাপ্ত হইয়াছি; আপনি আপনার টাকা প্রতি-গ্রহণ করিয়া আমাকে অব্যাহতি দিউন।" তখন জাফর বলিলেন, "আমি যাহা একবার দান করি, তাহা প্রতিগ্রহণ করা আমার রীতি নহে।" ইহা শুনিয়া সে নিরুত্তর হইয়া গেল। অবশেষে লোকের নিকট এই মহাপুরুষের পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল, "কি আশ্চর্য্য! ইনি প্রেরিতপুরুষ-বংশধর মাহাত্মা এমাম জাফর সাদেক; তুমি এ সংবাদ রাখ না?" লোকমুখে এমামের নাম শ্রবণে তাহার অন্তর চমকিত হইল; মুখ শুকাইয়া গেল; মর্ম্মদাহে সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ম্ম ছুটিতে লাগিল; লজ্জাবনত বদনে জোড়হস্তে দাঁড়াইয়া রহিল। অবশেষে মহানুভব তপস্বী জাফর তাহাকে মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করিয়া বিদায় প্রদান করিলেন।

এমাম জাফরের নিকট কোন ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া বলে, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে খোদাতায়ালার রূপ দেখাইয়া দিউন।" ইহাতে জাফর উত্তর করেন, "তুমি কি হজরত মুসার বিবরণ অবগত নহ? মুসা খোদার দর্শনাভিলাষী হইলে এই-রূপ দৈবাদেশ হয় যে, তুমি কখনও আমার দর্শন লাভ করিতে পারিবে না।" প্রশ্নকারী ইহা শুনিয়া বলিল, "তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু মুসার সেই সময় আর নাই। এখন মহাম্মদীয় ধর্ম্ম-বিধিমতে আমার বাসনা পূর্ণ হইতে পারে।" এই বাক্যে ধর্ম্ম-

ভীরু এমাম অসন্তুষ্ট হইয়া অনুচরদিগকে অনুমতি করিলেন, "ইহার হস্ত-পদ বন্ধন করিয়া কূপে নিক্ষেপ কর।" আজ্ঞামাত্র কার্য্য সম্পন্ন হইল। তাহাকে বন্ধন করিয়া কূপের জলমধ্যে একবার নিমজ্জিত করিয়া মহর্ষির ইঙ্গিতানুসারে পুনঃ জলের উপরিভাগে উঠান হইল। এই সময়ে সে করুণস্বরে চীৎকার করিয়া কহিল, "হে প্রেরিতপুরুষবংশধর! আমাকে রক্ষা করুন।" জাফর পুনর্ব্বার তাহাকে নিমগ্ন করিতে বলিলেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ নিমজ্জন ও উত্থান করার পর যখন সে অবশাঙ্গ ও হতাশ হইয়া আকুলকণ্ঠে নিদানের সম্বল সর্ব্বশক্তিমান্ আল্লাহতালাকে ডাকিতে লাগিল, তখন এমাম জাফর তাহাকে সত্বর কূপ হইতে উঠাইতে আজ্ঞা করিলেন। অনুচরেরা অচিরে আজ্ঞা পালন করিল। অনন্তর সে সুস্থ হওয়ার পর অবনত মস্তকে মহর্ষির সমীপস্থ হইলে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখন খোদার দর্শন পাইয়াছ তো?" সে মৃদুস্বরে কহিল "হজরত! আমি যে পর্য্যন্ত সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন পরমপিতাকে বিস্মৃত হইয়া অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতেছিলাম, তদবধি আমার চক্ষে অন্ধকার ব্যতীত অপর কিছুই দৃষ্ট হয় নাই। পরে যখন অনন্যোপায় হইয়া কাতরে সেই পরাৎপরের করুণাপ্রার্থী হইলাম, তখন দয়াময়ের প্রসাদে আমার অন্তরাবরণ তিরোহিত হইল; হৃদয়ের বদ্ধ দ্বার খুলিয়া গেল। আমি সর্ব্বব্যাপী সারাৎসারের পবিত্র সত্তা উপলব্ধি করিলাম; সেই অনাদি অনন্ত বিরাট্ পুরুষের সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইলাম। আমার

মনোভিলাষ পূর্ণ হইল; মানব-জন্ম সফল হইল। অধিক আর আপনার সমক্ষে কি নিবেদন করিব।” এতৎ শ্রবণে মহর্ষি জাফর কহিলেন, “এক্ষণে প্রণিধান কর, তুমি যতক্ষণ অপরকে ডাকিতেছিলে, ততক্ষণ মিথ্যারত ও পাপী ছিলে। সুতরাং অন্ধকার ভিন্ন অপর কিছুই দেখিতে পাও নাই। কিন্তু যেই মিথ্যা পথ পরিহার করিয়া সত্যের অনুসরণ করিলে, অমনি তোমার অন্তরাকাশ পরিষ্কৃত ও পরিচ্ছন্ন হইয়া গেল, তাহাতে বিশ্বেশ্বরের অপরূপ রূপ অনুভব করিলে। তাই বলিতেছি, অদ্য তুমি যে দ্বার প্রাপ্ত হইলে, পরম যত্নের সহিত তাহার তত্ত্বাবধান করিও।”

৪। খাজে ইব্‌রাহিম আদ্‌হাম বল্‌খী।*

মহাত্মা ইব্‌রাহিম আদ্‌হাম ধর্ম্মগগনের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র-স্বরূপ ছিলেন। তাঁহার সময়ে তৎসদৃশ পবিত্র সাধক পুরুষ অপর কেহই বিদ্যমান ছিলেন না। তাঁহার বাঙ্‌নিষ্ঠা, সততা

* ইঁহার প্রকৃত নাম সুলতান ইব্রাহিম, আদ্‌হাম ইঁহার পিতার নাম। ইনি সাধারণ্যে ইব্রাহিম আদ্‌হাম নামে পরিচিত। ইঁহারা দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরের বংশ হইতে সমুৎপন্ন।

ও অবিশ্রান্ত ধ্যান-ধারণার কথা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সর্ব্বোপরি তাঁহার ত্যাগ-স্বীকার এ জগতে এক অসাধারণ ও অতুলনীয় দৃষ্টান্তস্থল। তিনি বহু সাধু পুরুষের সন্দর্শন লাভ করেন এবং অনেক সময় মহামনস্বী ধর্ম্মাত্মা হজরত আবু হানিফার সুখসহবাসে অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, এক দিন মহর্ষি ইব্রাহিম আদ্হাম, এমাম আবু হানিফার সাক্ষাৎকার বাসনায় উপস্থিত হইলে, এমাম সাহেবের সভাস্থ ব্যক্তিবর্গ তাঁহার প্রতি যথোচিত সমাদর প্রদর্শন করেন নাই। হজরত আবু হানিফা সেই অসহনীয় অন্যায় দৃশ্য দর্শনে সকলকে সম্বোধন করিয়া বলেন,"দেখ, তোমরা ইব্রাহিমকে তাচ্ছিল্য করিও না। ইব্রাহিম আমাদিগের মধ্যেও প্রধান।" সভাসদ্বর্গ বলিলেন, "ইব্রাহিম প্রাধান্য প্রাপ্ত হইলেন কি প্রকারে? কি এমন কার্য্য করিয়াছেন যে, তজ্জন্য ইনি এতাদৃশ গৌরবের পাত্র হইতে পারেন?" এমাম সাহেব উত্তর দিলেন, "ইব্রাহিম নিয়তই খোদাতালার ধ্যানে মগ্ন থাকেন; আর আমরা বিবিধ সাংসারিক কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কখন কখন ধর্ম্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হই। ইহাতেই ইঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অবধারণ করিবে।" দেখুন, প্রিয় পাঠক! যখন স্বয়ং এমাম-প্রধান হজরত আবু হানিফা যাঁহার সম্বন্ধে এরূপ উচ্চ ও উদার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তখন এই মহাত্মার ধার্ম্মিকতার বিষয়ে আর কি প্রশংসা কীর্ত্তিত হইতে পারে?

ইব্‌রাহিম আদ্‌হাম বল্‌খও বোখারা রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রজাবৃন্দ পরমানন্দে নিবসতি করিত। যখন তিনি নগরভ্রমণে বহির্গত হইতেন, তখন তাঁহার রাজোচিত আড়ম্বরের সীমা থাকিত না; তাঁহার অগ্র-পশ্চাৎ শস্ত্রসুসজ্জিত সৈনিক-পুরুষগণ দম্ভভরে পদক্ষেপ করিয়া গমন করিত। যে অপূর্ব্ব ঘটনায় তাঁহার জীবনের পরিবর্ত্তন ঘটে, নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইতেছে।

এক রজনীতে, নৃপতি ইবরাহিম আদ্‌হাম স্বীয় প্রাসাদে মণিমুক্তাবিখচিত স্বর্ণময় পর্য্যঙ্কোপরি সুকোমল সুখ-শয্যায় শয়ান ছিলেন। যখন যামিনীর দ্বিতীয় যাম সমুপস্থিত, সেই সময়ে প্রাসাদের ছাদ সহসা কম্পিত হইয়া উঠিল, অনুভব করিলেন। এই গভীর নিশিতে ছাদের উপরে কে বিচরণ করিতেছে? ইহা অবগত হইবার জন্য তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "এ অসময়ে ছাদের উপরে তুমি কে?" তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল "আমার উষ্ট্র হারাইয়া গিয়াছে, তাহার অন্বেষণ করিবার জন্য এস্থানে আসিয়াছি।" এই কথায় তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "ছাদের উপরে কি উষ্ট্র আসিতে পারে? একি অদ্ভুত কথা! বলিহারি তোমার বুদ্ধিকে।" এই অবজ্ঞাসূচক তিরস্কার বাক্য পরিসমাপ্তির পর মুহূর্ত্তেই উত্তর আসিল, "হে ভ্রান্ত! তুমি রত্নাভরণে স্বর্ণ-বিখচিত মনোরম পরিচ্ছদে সুসজ্জিত হইয়া রাজাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া জগদীশ্বরের অনুসন্ধান কর, ইহাও কি সম্ভব? তোমার কার্য্য অপেক্ষা আমার কার্য্য অধিক কি

আশ্চর্য্যজনক ও অসম্ভব দেখিলে, বল দেখি ?” এই তীব্র বচনে নরপতি ইব্রাহিম চমকিত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার অন্তরে বিষম আশঙ্কার উদ্রেক হইল। তিনি চিন্তানলে ভস্মীভূত হইয়া বিষণ্ণ অন্তরে কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইলেন।

অনন্তর দ্বিতীয় দিবসে, যখন তিনি রাজদরবারে উপবিষ্ট আছেন, সভাসদ্‌বর্গ সকলেই যথাস্থানে সমাসীন, সশস্ত্র প্রহরিগণ ভীষণদর্শন যমদূতের ন্যায় দ্বার রক্ষা করিতেছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ এক জন উজ্জ্বল প্রভাবিশিষ্ট প্রকাণ্ড-শরীর পুরুষ দ্রুত পাদবিক্ষেপে তথায় উপস্থিত হইলেন। সেই তেজোবীর্য্যশালী নির্ভীক বিরাট্ পুরুষের বিরাট্ মূর্ত্তি দর্শনে সকলেই ভীতচকিত চিত্তে কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। কাহার মুখে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই, হৃদয়ে বল নাই, নিশ্বাস-প্রশ্বাস বহিতেছে কি না সন্দেহ। আজ যেন রাজসভা নির্জ্জীব প্রস্তর-মূর্ত্তিসমূহে পরিপূর্ণ! কি অভূতপূর্ব্ব ভীষণ ব্যাপার!! সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাপুরুষ এরূপ দ্রুতগতিতে দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলেন যে, ভীষণদর্শন সশস্ত্র দ্বার-রক্ষকগণ বা সৈন্যসামন্তগণের মধ্যে কেহই “আপনি কে, বা কি জন্য যাইতেছেন,” এ কথাটীও বলিতে সমর্থ বা সাহসী হইলেন না, সকলেই যেন কি এক যাদুবিদ্যার প্রভাবে বাক্যহীন হইয়া পড়িলেন। তিনি সিংহাসনের সম্মুখভাগে সমুপস্থিত হইলে ধর্ম্মভীরু ভূপতি ইব্রাহিম কহিলেন, “আপনি কি অভিপ্রায়ে এখানে আসিয়াছেন? কোন্ বস্তু আপনার

প্রয়োজন ?” আগন্তুক পুরুষপ্রবর উত্তর করিলেন, “অমি কিছুই চাহি না, এই পথিকাশ্রমে আসিয়াছি মাত্র।” ইব্রাহিম কহিলেন, ইহা ত পথিকাশ্রম নহে, এ যে রাজপ্রাসাদ!” ইহাতে তিনি, নৃপতি ইব্‌রাহিমকে পুনর্ব্বার কহিলেন, “এ তোমার রাজপ্রাসাদ ? উত্তম। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি, তোমার অগ্রে এ ভবনে কে বাস করিত ?

ইব্‌রাহিম। আমার পূজনীয় পিতা মহাশয় বাস করিতেন।

আগন্তুক। তোমার পিতার পূর্ব্বে এ প্রাসাদে কোন্ ব্যক্তি অবস্থিতি করিতেন ?

ইব্‌রাহিম। আমার পরমার্চ্চনীয় পিতামহ মহাশয়।

আগন্তুক। তাহার পূর্ব্বে কে থাকিতেন ?

ইবরাহিম। অপর এক ব্যক্তি এ ভবনের অধিবাসী ছিলেন।

এবম্প্রকার উত্তর প্রত্যুত্তরের পর সেই অপরিচিত পুরুষ হাস্যমুখে কহিলেন, “তবে ইহা পথিকাশ্রম নহে, বলিতেছ কি প্রকারে ? যখন এখানে কেহই স্থায়িরূপে বাস করিতে পারে না, এক ব্যক্তি আইসে, অপর ব্যক্তি চলিয়া যায়, তখন ইহা পথিকাশ্রম নহে, কে বলিতে পারে ?” এই কথা পরিসমাপ্তির পরক্ষণেই তিনি ক্ষিপ্রপদে প্রস্থানপরায়ণ হইলেন! কিন্তু ইব্‌রাহিমের অন্তর সেই জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণে উদাসীন ভাব অবলম্বন করিল, তিনি সিংহাসন হইতে ত্বরিত গাত্রোত্থান করিয়া তদীয় পশ্চাদনুসরণ করিলেন। কিয়দ্দূর গমনান্তর তাঁহার সম্মুখীন

হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে? অনুগ্রহ করিয়া প্রকাশ করুন।" উত্তর হইল, "আমি খেজের।" মহাত্মা খেজেরের নাম শ্রবণমাত্র ইব্‌রাহিমের অন্তরে অনন্তশিখায় বৈরাগ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, বড়ই বেদনা বোধ করিলেন। তাই তিনি বনগমনার্থ অগৌণে অশ্ব প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিলেন।

অবিলম্বে অশ্ব সজ্জিত করিয়া আনীত হইল। বল্‌খপতি ঘোটকারোহণে সৈন্য-সামন্তাদিসহ অরণ্যের দিকে প্রধাবিত হইলেন। যথাকালে কাননে উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পর্য্যটন করিতে করিতে তিনি সৈন্যগণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। এই একেশ্বর অবস্থায় গভীর বনমধ্যে "ভ্রান্ত! নিদ্রা হইতে চেতন হও" সহসা এই ধ্বনি তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। উপর্য্যুপরি তিন বার এই দৈববাণী শ্রুত হইল। পরে চতুর্থ বার "মৃত্যু হইতে চৈতন্য প্রাপ্ত হইবার অগ্রে জাগিয়া উঠ" এই অভিনব শব্দ কর্ণগোচর করিলেন। এই অপূর্ব্ব দৈব ঘটনায় ইব্‌রাহিম স্তম্ভিত, শঙ্কিত ও চমকিত হইলেন। চিন্তাকুলচিত্তে ভাগ্যগণনা করিতেছেন, ইত্যবসরে একটী কুরঙ্গ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি দ্রুত সেই হরিণের পশ্চাৎ অশ্বচালনা করিলেন। কিন্তু কি অলৌকিক ব্যাপার! অশ্বারোহীর ঐকান্তিক ব্যগ্রতা দেখিয়া বিপন্ন হরিণ আর অগ্রসর হইল না, এক স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দীননেত্রে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক কহিল, "রাজন্! বিধাতার অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মে আমি হরিণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আপনি আমার হননার্থ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। কিন্তু

হায়, আপনি কি এই নিতান্ত নিষ্ঠুরতার কার্য্য সাধনোদ্দেশ্যেই ইহ জগতে সৃষ্ট হইয়াছেন ? আপনার কি অপর কোন কার্য্য নাই ?” হরিণ-মুখনিঃসৃত এই উক্তি শুনিয়া ইব্‌রাহিম চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। হরিণ হনন করিবেন কি, চিন্তার বিবিধ তরঙ্গ তাঁহার হৃদয়সমুদ্র উদ্বেলিত করিয়া তুলিল। ইহা যে বিধির নির্ব্বন্ধ, তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিলেন। সেই বিশ্ব-নিয়ন্তা বিশ্বপতির অনুগ্রহে ক্রমশঃ তাঁহার চিত্তশুদ্ধি হইয়া জ্ঞানালোকসম্পন্ন হইতে লাগিল। তখন সুখধাম স্বর্গের দ্বার খুলিয়া গেল ; নিঃসন্দেহ বিশ্বাসের উজ্জ্বল প্রভায় তাঁহার অন্তঃকরণ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি দরবিগলিত অশ্রুধারে গণ্ডস্থল প্লাবিত করিয়া পরিচ্ছদ অভিষিক্ত করিয়া ফেলিলেন এবং অনুশোচনার তীব্র তাড়নে অস্থির হইয়া ম্লানমুখে গন্তব্য পথ পরিত্যাগ করিয়া যদৃচ্ছা চলিতে আরম্ভ করিলেন।

ইব্‌রাহিম উদাস মনে যাইতে লাগিলেন। আজ তাঁহার সুখ, শান্তি, উৎসাহ, আগ্রহ সকলই তিরোহিত হইয়াছে। বাহ্য দৃষ্টি আছে বটে, কিন্তু তাহা অন্তর্দৃষ্টিতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে—সে দৃষ্টি আন্তরিক ভাবগর্ভেই নিহিত। সহসা এক্ জন রাখাল তাঁহার দৃষ্টি-পথের পথিক হইল। সে কম্বলাসনে উপবিষ্ট, তাহার মস্তকে কম্বল-নির্ম্মিত মলিন টুপী ;পরিধেয় বসনখানি অতি জীর্ণ ও পূতিগন্ধময়। বল্‌খপতি রাখালের সেই অপরিষ্কৃত টুপী ও ছিন্ন বস্ত্রের বিনিময়ে আপনার মণিমাণিক্য-বিজড়িত স্বর্ণময় শিরোভূষণ ও বহুমূল্য পরিচ্ছদ তাহাকে পরাইয়া দিয়া

স্বয়ং দীনহীন ফকির বেশে সজ্জিত হইলেন। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! কি অত্যদ্ভুত ঘটনা!! যে নবনীত-নিন্দিত সুকোমল দেহ চিরদিন কমনীয় বসনভূষণে অলঙ্কৃত ছিল, আজ তাহা কঠিন ছিন্ন কম্বলাবৃত হইল!!! আজ তাঁহার নয়নে রাজকীয় বেশভূষা অতি তুচ্ছ বলিয়া অনুমিত হইল। নিজের অশ্বটী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। পরাৎপর পরমেশ্বরের প্রসাদে অচিরে তাঁহার জ্ঞাননেত্র বিকশিত হইল; সেই সুদুর্লভ দেবদৃষ্টিতে বিশ্বেশ্বরের স্বর্গীয় বিভবরাশি বিভাসিত হইল। আজ তিনি অচিরস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর পার্থিব সুখসম্পদের পরিবর্ত্তে অনন্ত ও অবিনশ্বর সুখ-সম্পত্তির অধিকারী হইলেন;—একাকী নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে সেই শ্বাপদসঙ্কুল গভীর অরণ্যানী মধ্যে আপন পাপ স্মরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

এইরূপে উন্মত্তের ন্যায় রোদন করিতে করিতে একদা তিনি একটী নদী-সৈকতে যাইয়া সমুপস্থিত হন। নদীর উপরি-ভাগে সেতু ছিল, জনৈক মন্দভাগ্য অন্ধকে সেই সেতু উত্তীর্ণ হইবার কালে জলগর্ভে পতনোদ্যত দেখিয়া পুণ্যব্রত ইব্রাহিম ব্যথিত হইয়া কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিলেন "হে সর্ব্বান্তর্য্যামিন্! হে করুণানিধান বিশ্ববিধাতঃ! তোমার এই নিঃসহায় দীনহীন অন্ধ সন্তানকে বিপদ্ হইতে রক্ষা কর—পতনজনিত অপমৃত্যু হইতে বাঁচাও।" ভক্তের আকুল আহ্বানে দয়াময়ের অন্তর দয়ার্দ্র হইল। অন্ধ শূন্যমার্গে পদ প্রসারিত করিতেই মহিমার্ণ-বের মহিমা-প্রভাবে অবিচলিত অবস্থায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান

রহিল। তখন ইব্‌রাহিম ত্বরিতপদে ধাবিত হইয়া গিয়া তাহার উদ্ধার সাধন করিলেন। লোকে এই অমানুষিক ঘটনা দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গেল।

অনন্তর তিনি নেশাপুরে * যাইয়া এক পর্ব্বত-গহ্বরে আপনার বাসস্থান মনোনীত করিয়া লইলেন। এই গিরি-গর্ভে ইব্‌রাহিম নয় বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। এখানে থাকিয়া তিনি যেরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। প্রকৃত ধর্ম্মপিপাসু সাধক ব্যতীত অপরে তাদৃশ ব্রতোদ্‌যাপনে কখনই সমর্থ নহে। বলিতে কি, সেই নির্জ্জন প্রদেশের চির অন্ধকারময় বিজন পর্ব্বত-কন্দরে অসহনীয় শীতের এতই প্রবল প্রভাব ছিল যে, তাহাকে শীতের আগার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এ হেন জীবন-সংশয়জনক ভীষণ স্থানে, আজন্ম সুকোমল সুখের ক্রোড়ে প্রতিপালিত নরপাল ইব্‌রাহিম অসাড় জড়পিণ্ডের ন্যায় মুদিত-নেত্রে অবিশ্রান্ত যোগ-সাধনে নিরত থাকিতেন। সপ্তাহের মধ্যে প্রতি বৃহস্পতিবারে তিনি গুহা-নিষ্ক্রান্ত হইয়া জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ লইয়া আসিতেন, পরদিবস শুক্রবার প্রভাতে সেই সংগৃহীত কাষ্ঠ নেশাপুরের বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয় করত জুম্মার সাপ্তাহিক নামাজ (উপাসনা) নির্ব্বাহ জন্য মস্‌জেদে গমন করিতেন। নামাজ সমাপনান্তে সাধকপ্রবর কাষ্ঠবিক্রয়-লব্ধ অর্থে রুটী ক্রয় করিয়া অর্দ্ধেক দীন-দুঃখীদিগকে দিয়া

* নেশাপুর—আফগানিস্তানের একটী নগর।

অপরার্দ্ধেক নিজের সাত দিবসের ভোজনার্থ লইয়া প্রস্থান করিতেন। এইরূপ অবস্থায় মহর্ষি একাদিক্রমে দীর্ঘ কাল যাপন করিয়াছিলেন।

এক রজনীতে শীতাধিক্য বশতঃ গিরি-গর্ভ বরফাচ্ছন্ন হইয়াছিল। তপোধন ইব্‌রাহিম তদ্ধেতু নিরতিশয় শীতার্ত্ত হন। তাঁহার বরফার্দ্র দেহ শীতে থরথর কাঁপিতেছে, জীবন সংশয় প্রায়, আর তিষ্ঠিতে পারেন না। তখন সেই অসহ্য যন্ত্রণার নিরাকরণ মানসে বরফস্তূপের নিম্নে প্রোথিত থাকিয়া মনে মনে ভাবিলেন, "হায়, এ সময় যদি আগুন পাইতাম, তবে আমার ক্লেশের অবসান হইতে পারিত।" কি আশ্চর্য্য! যেই কামনা, সেই কার্য্য, যেই প্রবৃত্তি, সেই নিবৃত্তি, যেই সঙ্কল্প, পর মুহূর্ত্তেই সিদ্ধি! এরূপ নহিলে কি বাঙ্‌নিষ্ঠা! এরূপ নহিলে কি তপোপ্রভাব! মহর্ষির চিন্তার গতি মনোমধ্যে বিলীন হইতে না হইতে সেই ভক্তরঞ্জন ভুবনেশ্বরের মাহাত্ম্যবলে ইব্‌রাহিম পৃষ্ঠদেশে উষ্ণতা অনুভব করিলেন; তদ্দ্বারা শীঘ্রই শীতের প্রভাব দূরীভূত হইল; তিনি জীবনে আরাম পাইলেন, অমনি অবনত দেহে নিদ্রাগত হইলেন। পরে প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখেন, এক প্রকাণ্ডকায় ভীষণ ভুজঙ্গম পশ্চাৎভাগে পতিত রহিয়াছে। বুঝিলেন, এই বিষাকর বিষধরের দৈহিক উষ্ণতা হইতেই তাঁহার শরীরে তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল। তখন তাঁহার অন্তরে ভয়ানক ভয়ের উদ্রেক হইল। গদ্‌গদ স্বরে কহিলেন, "হে আমার প্রতিপালক ও রক্ষক! প্রথমে যাহাকে

দয়ার মূর্ত্তিতে প্রেরণ করিয়াছিলে, শেষে সেই আবার ভীষণ-মূর্ত্তি দেখাইল! আমি আর কি করিব? তুমি কৃপা না করিলে ইহাকে দূরীভূত করা আমার সাধ্যের অতীত।" এই প্রার্থনায় সর্পরাজ দ্রুতবেগে হেলিতে দুলিতে গিরি-গহ্বর অভ্যন্তরস্থ স্বীয় বিবরে প্রবিষ্ট হইল।

কথিত আছে, তপস্বিপ্রবর ইব্রাহিম, চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত বহু জনপদ ও পর্ব্বত প্রান্তরাদি পর্য্যটন করিয়া পরিশেষে পবিত্র মক্কা-শরিফে আগমন করেন। মক্কাবাসী ধর্ম্মশীল সাধুবৃন্দ মহর্ষির সমাগম সংবাদ পাইয়া তৎপ্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনার্থ নগর বহির্ভাগে আনিতে যান। কিন্তু ইব্রাহিম সেই সম্মান ও গৌরবের বিষয় একবার মনেও স্থান দিলেন না। বরং তিনি উহা হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিবার অভিপ্রায়ে আত্মগোপন করিলেন। পাছে কেহ চিনিতে পারে, এই ভয়ে তিনি সাধারণ ভৃত্যের ন্যায় যাত্রিদলের অগ্রে অগ্রে চলিলেন। এদিকে মক্কাবাসী সাধুগণের জনৈক পরিচারক স্বীয় প্রভুর কথানুসারে মহর্ষির অন্বেষণ করিতে যায়, সে ইব্রাহিমেরই নিকটে উপস্থিত হইয়া বলে, "হজরত ইব্রাহিম কোথায়? তিনি নিকটবর্ত্তী হইয়াছেন, কি না বলিতে পার? মক্কা নগরীর প্রধানবর্গ তাঁহার সাক্ষাৎকার বাসনায় এখানে আগমন করিয়াছেন।" ইব্রাহিম ইহা শুনিয়া তাহাকে কহিলেন, "সেই পাপাত্মার নিকটে তাঁহাদের কি প্রয়োজন আছে?" এই অবজ্ঞার কথা শ্রবণ করিয়া পরিচারক রোষে উগ্র মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক

তাঁহার গ্রীবাদেশে ও গণ্ডস্থলে সজোরে মুষ্ট্যাঘাত করিতে লাগিল এবং কহিল, "পামর! তুই ধর্ম্মপরায়ণ সাধু পুরুষের প্রতি ঈদৃশ অসম্মানের কথা বলিস্। তোর মত পাপাত্মা ও নরাধম কেহ নাই।" ইব্রাহিম প্রহৃত হইয়াও বিচলিত হইলেন না; পরন্তু মৃদুস্বরে কহিলেন, "আমিও তো এই কথা বলিয়াছি। তোমরা তাহা না বুঝিয়া আমার উপর ক্রুদ্ধ হইলে।" পরে পরিচারক ও অপর সকলে অন্য দিকে চলিয়া গেলে ইব্রাহিম আপন নফ্সকে (আত্মাকে) কহিলেন, "কেমন শাস্তির আস্বাদ পাইলে তো?" ইহাই বলিয়া তিনি জগদীশ্বরকে স্মরণ করত ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন। পরিশেষে যখন সত্য প্রকাশিত হইল, সকলে তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল, তখন সেই পরিচারক কম্পিতকলেবরে তাঁহার পদানত হইয়া বিবিধ প্রকারে অপরাধের মার্জ্জনা চাহিল। এই সময় হইতে মহর্ষি মক্কাবাস করেন। তথায় বহু লোক তাঁহার নিকটে ধর্ম্মতত্ত্বে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। মক্কা অবস্থান কালে শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা তাঁহার জীবিকা উপার্জ্জিত হইত,—কখন জঙ্গল হইতে কাষ্ঠ আনিয়া, কখন বা খরমুজা লইয়া বিক্রয় করিতেন।

তপোধন যখন ফকিরবেশে রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, সেই সময়ে তাঁহার একটী দুগ্ধপোষ্য শিশু-তনয় বর্ত্তমান ছিল। সেই পুত্র বয়স্থ ও জ্ঞানবান্ হইয়া আপন মাতাকে পিতার কথা জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে বল্খেশ্বরীর নির্ব্বাপিত শোকানল পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া উঠে। তিনি সজলনেত্রে কাতরে

পুত্রের নিকটে স্বামীর সংসারাশ্রম পরিত্যাগের বিষয় আদ্যোপান্ত বিবৃত করণান্তর কহিলেন, "বৎস! সংবাদ পাইয়াছি, এক্ষণে তিনি পবিত্র মক্কা-তীর্থে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া স্বীয় ভরণপোষণ নির্ব্বাহ করেন।" রাজপুত্র জননীর মুখে এই দুঃখের বার্ত্তা শুনিয়া বড়ই সন্তপ্ত হইলেন এবং কহিলেন "মাতঃ! আমি পবিত্র মক্কাতীর্থ দর্শনে গমন করিব। তথায় শাস্ত্রসম্মত ব্রতোদ্‌যাপন করিব এবং পূজনীয় পিতৃদেবের অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার চরণ সেবায় নিযুক্ত থাকিব। আপনি বল্‌খ নগরে ঘোষণা করিয়া দিউন, যে ব্যক্তি পবিত্র হজ-ব্রত পালনে ইচ্ছুক, আমার সঙ্গে যাইলে আমি তাহার যাবতীয় ব্যয়-ভার বহন করিব।" পুত্রের সদিচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া বল্‌খ-রাজমহিষী নগরে এই শুভ সংবাদ ঘোষণা করিতে অনুমতি দিলেন; তাহাতে দলে দলে মক্কাযাত্রী লোক আসিয়া রাজ-প্রাসাদে সমবেত হইতে লাগিল। বিশ্বস্ত বিবরণে অবগত হওয়া যায় যে, এই সমস্ত হজপ্রার্থী সংখ্যায় চারি সহস্র হইয়া-ছিল। যাহা হউক, রাজনন্দন মাতার সহিত এই সমস্ত লোক সঙ্গে লইয়া পিতার দর্শন লাভ বাসনায় মক্কাযাত্রা করিলেন।

রাজকুমার মক্কায় উপনীত হইয়া পবিত্র কাবা মস্‌জিদের অনতিদূরে কয়েক জন দরবেশকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি মহাত্মা ইব্‌রাহিম আদহামের সংবাদ রাখেন? তাঁহার বাসস্থান কোথায়? যদি জানা থাকে, অনুগ্রহপূর্ব্বক বলিয়া দিলে পরমোপকৃত হইব।" এই প্রশ্নে দরবেশেরা কহিলেন

'আমরা তাঁহার সহিত বিলক্ষণ পরিচিত আছি। তিনি আমাদের গুরু, এক্ষণে তিনি কাষ্ঠ-সংগ্রহার্থ জঙ্গলে গিয়াছেন। সেই কাষ্ঠ-বিক্রয়লব্ধ অর্থে তাঁহার নিজের এবং আমাদের জন্য খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া লইয়া তিনি সত্বর প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।"

পিতার ভীষণ ক্লেশের কথা শুনিয়া পুত্র দুর্ব্বিষহ মর্ম্ম-বেদনায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। তিনি চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইয়া সেই স্থান হইতে জঙ্গলাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে দেখেন, বৃদ্ধ বল্‌খরাজ কাষ্ঠভার মস্তকে লইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছেন। অহো কি আক্ষেপ! অহো কি পরিতাপ!! অহো কি অসহনীয় দৃশ্য!! হায়, এই কি সেই বল্‌খেশ্বর! এই সেই নরপতি! যাঁহার অতুলনীয় সুখ-সমৃদ্ধি ও আড়ম্বরের কথা শুনিলে চমৎকার-রসে দ্রবীভূত হইতে হয়, এই কি সেই রাজাধিরাজ! যাঁহার ভাণ্ডার মহামূল্য মণিমাণিক্যে পরিপূর্ণ এবং দ্বারদেশে নিয়ত হয়-হস্তি-সৈন্য-সামন্তের সমাবেশ, এই সেই প্রকৃতি-রঞ্জন মহামান্য নরপাল! যিনি সভাসদ্‌বর্গে পরিবৃত হইয়া নক্ষত্ররাজিমধ্যে লাবণ্যনিলয় পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন, যাঁহার আজ্ঞা পরিপালনার্থ অসংখ্য পরিচারক নতমস্তকে দণ্ডায়মান থাকিত এবং যাঁহার অঙ্গুলিসঙ্কেতে একটী বিস্তীর্ণ রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইত, এই সেই মহীপতি! মানব!—মায়ামুগ্ধ অপরিণামদর্শী মানব! দেখ, বিধাতার কি অপূর্ব্ব লীলা, কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন!!

পিতার এই শোচনীয় দুরবস্থা দেখিয়া পুত্রের শোকসিন্ধু উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার হৃদ্‌পিণ্ড যেন সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করিতে লাগিল; বিশ্ব সংসার তিমিরাচ্ছন্ন বোধ হইল; তিনি ম্রিয়মাণ হইয়া আকুলকণ্ঠে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোনরূপে উচ্ছ্বসিত শোকাবেগ সংবরণ করিয়া ধীরে ধীরে পিতার পশ্চাদনুসরণ করিলেন।

অনন্তর উদাসীন ইব্‌রাহিম কাষ্ঠ-বিক্রীত অর্থে রুটী ক্রয় করত যথাস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং শিষ্য ও সমাগত বন্ধুদিগকে সেই রুটী বিভাগ করিয়া দিয়া আপন অংশ গ্রহণ-পূর্ব্বক নামাজে নিমগ্ন হইলেন। পরে নামাজান্তে পুত্রের প্রতি সতৃষ্ণনয়নে বারংবার দৃষ্টিপাত করায়, শিষ্যমণ্ডলী গুরুদেবের ভাবান্তর দর্শনে কারণ-জিজ্ঞাসু হইলে তিনি কহিলেন, "আমি সংসার পরিত্যাগকালে একটী শিশুসন্তান গৃহে রাখিয়া আসিয়া-ছিলাম। আকৃতি-প্রকৃতি দেখিয়া বোধ হয়, এই আমার সেই সন্তান। ইহাকে দেখিয়া পর্য্যন্ত আমার মন অতীব স্নেহাকৃষ্ট ও মায়ামুগ্ধ হইয়াছে। বলিব কি, সে স্নেহ, সে মায়ামমতা আমি কিছুতেই নিবারণ করিতে পারিতেছি না।" গুরুর এই বাক্য শুনিয়া জনৈক দরবেশ পরদিন বল্‌খরাজপুত্রের নিকটে যাইয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন। রাজকুমার যথাযথ নিজ বিবরণ বিবৃত করিলে দরবেশ কহিলেন, "চল, আমি তোমাকে এবং তোমার মাতৃদেবীকে মহর্ষির নিকট সঙ্গে লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিব।" তখন অভীষ্টসিদ্ধির শুভ সুযোগ স্বতঃই

সমুপস্থিত দেখিয়া মাতা-পুত্রে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া দয়ালু দরবেশের সহিত প্রফুল্লচিত্তে প্রস্থান করিলেন।

মহর্ষি ইব্‌রাহিম নিজ কুটীরে আসীন, শিষ্যবর্গ চতুর্দ্দিকে নতভাবে মধুর গুরূপদেশ শ্রবণে নিরত ; এমন সময়ে বল্‌খরাজ-রাজেশ্বরী পুত্রসহ তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞী স্বামীকে দেখিবা-মাত্র চিনিয়া আপন পুত্রকে চীৎকার করিয়া দুঃখকম্পিতস্বরে কহিলেন "বৎস, ঐ দেখ তোমার পিতৃদেব।" এই কথায় সেই তাপসকুটীরে সহসা ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল, সকলেরই চক্ষে অশ্রু ঝরিল। মহর্ষিরও স্নেহ-সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইয়া হৃদয় প্লাবিত করিল। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া পুত্রকে আগ্রহে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন। অতঃপর পিতাপুত্রে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হওয়ার পর মনে করিলেন, "এ কি! যে বিষম মায়া-জাল ছিন্ন করিয়াছি, তাহাতেই আবার বিজড়িত!" ইহা ভাবিয়া তিনি মায়াপাশ ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হায় সকলই বৃথা হইল, পুত্রের কাতরোক্তিতে, প্রিয়ম্বদা প্রেয়সীর করুণ বচনে সে কার্য্য সাধন করিতে পারিলেন না। তখন সংসারবিরাগী তপস্বী মহাবিপদাপন্ন হইলেন। কি করিবেন ? অবশেষে উপায়ান্তর বিহীন হইয়া যেই ঊর্দ্ধমুখে আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি তাহার পর মুহূর্ত্তে পিতার ক্রোড়ের উপরে থাকিয়া বিধাতার ইচ্ছায় পুত্রের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটিল।

এই দারুণ দুর্ঘটনায় মহাকোলাহল পড়িয়া গেল। আর্ত্তনাদে

গগন প্রতিধ্বনিত হইল। বল্‌খেশ্বরী চক্ষের পুতুলী, জীবনের সম্বল পুত্ররত্ন-হারা হইয়া উন্মাদিনী হইলেন। অপরাপর ব্যক্তিবৃন্দ স্তম্ভিত ও মুহ্যমান! শিষ্যমণ্ডলী এই হৃদয়বিদারী শোকাবহ ঘটনায় মর্ম্মাহত হইয়া কহিলেন, "প্রভো! এ কি করিলেন? নিরপরাধে এই বালকের,—স্বীয় পুত্রের প্রাণ-হন্তারক হইলেন? হা এ দুঃখ রাখিবার কি স্থান আছে?" ইব্‌রাহিম কহিলেন, "হে প্রিয়গণ! জানিও, ইহা সেই সর্ব্বদর্শী বিশ্ব-বিধাতার খেলা। আমি কি করিব? যখন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলাম, তখন এইরূপ দৈববাণী শ্রুতিগোচর হইল, "ইব্‌রাহিম! তুমি না আমার বন্ধুত্বের,—আমার প্রণয়ের দাবী রাখ? জান, আমি এক ও অদ্বিতীয় এবং আমার কেহ অংশী নাই। তবে তুমি সে প্রেমের—সে বন্ধুত্বের অংশ অপরকে অর্পণ করিতেছ কেন? তুমিই ত শিষ্যবর্গকে স্ত্রী-পুত্রাদির মায়ায় মুগ্ধ হইতে নিষেধ করিয়া থাক। এক্ষণে নিজেই তাহার বিপরীত কার্য্য করিতেছ?" ইহা শুনিয়া আমি বিষম লজ্জিত হইয়া প্রার্থনা করিলাম,—"হে পরমকারুণিক জগৎপতে! পুত্রস্নেহ যদি তোমার পবিত্র প্রণয়-পথের প্রতিবন্ধক উপস্থিত করিল, তবে আর আমার এ জীবনের প্রয়োজন কি? হয় আমার, না হয় আমার পুত্রের প্রাণসংহার করিয়া এ অপরাধের উপসংহার কর।" এই প্রার্থনায় মঙ্গলময়ের যাহা ইচ্ছা, তাহা কার্য্যেই ব্যক্ত হইয়াছে, আমি কি করিব? আমার কি অপরাধ আছে?"

ইহা বলিয়া তিনি গম্ভীরভাবে মৌনাবলম্বন করিলেন। পাঠক! অকৃত্রিম ও অপার্থিব ঐশী প্রেমিকতার কি অপূর্ব্ব, অদ্বিতীয় ও জ্বলন্ত প্রভাব, একবার প্রণিধান করিয়া দেখুন !!!

এক সময়ে ইব্‌রাহিম কোন বাগানে প্রহরীর কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার যাহা কিছু প্রাপ্তি হইত, তদ্দ্বারা তিনি নিজের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। এক দিন উদ্যানস্বামী উদ্যানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সুমিষ্ট দাড়িম্ব আনিয়া দিতে অনুমতি করিলেন। তাহাতে ইব্রাহিম অবিলম্বে কতকগুলি দাড়িম্ব আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধারণ করিলেন। উদ্যানপতি সেই দাড়িম্ব ভাঙ্গিয়া মুখে দিয়া বদন বিকৃতপূর্ব্বক ক্ষুণ্ণমনে কহিলেন, "এ কি, এত দিন পর্য্যন্ত এই বাগানে রহিয়াছ, কোন্ বৃক্ষের ফল মিষ্ট, এবং কোন্ বৃক্ষের ফল অম্ল, তাহার সংবাদ রাখ না?" ইব্রাহিম্ কহিলেন, "বাগানের রক্ষণাবেক্ষণ জন্যই আমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু ফল ভক্ষণ করিতে ত অনুমতি করেন নাই! সুতরাং ফলের মিষ্টতা বা অম্লতার বিষয় আমি কেমন করিয়া জানিব?" এই উত্তর শুনিয়া উদ্যানস্বামী বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে কহিলেন, "আপনি কি মহাত্মা ইব্রাহিম আদ্‌হাম? তিনি ব্যতীত এরূপ কার্য্য— এরূপ অপূর্ব্ব লোভসংবরণ আর কাহার নিকট আশা করা যাইতে পারে?" মহর্ষি ইব্রাহিম এই আত্মপ্রশংসাবাদ শ্রবণ-মাত্র সেই বাগান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন।

মহর্ষির বসরা গমনকালে, পথিমধ্যে জনৈক যোদ্ধৃপুরুষ

"লোকালয় কোন্ দিকে আছে?" জিজ্ঞাসা করায় তিনি কবর-গাহ্ (সমাধিস্থান) প্রদর্শন করেন। তাহাতে সৈনিক ব্যক্তি ক্রোধান্ধ হইয়া "কি আমার সহিত বিদ্রূপ!" এই কথা বলিয়া তাঁহাকে ভয়ানক প্রহার করে। তাহাতে তিনি মস্তকে বড়ই আঘাত প্রাপ্ত হন। সেই দুর্দ্দান্ত নির্ম্মম যোদ্ধা তাহাতেও ক্ষান্ত না হইয়া তাঁহাকে বন্ধন করত নগরাভিমুখে লইয়া যায়। নগরবাসিগণ মহর্ষির এই অসম্ভাবিত দুর্দ্দশা দেখিয়া শোকোচ্ছ্বসিত প্রাণে হাহাকার করিয়া উঠিল; চতুর্দ্দিকে কোলাহল পড়িয়া গেল। সকলে পরুষ বাক্যে সেই হীনবুদ্ধি সৈনিককে বিস্তর অনুযোগ করিল। তখন যোদ্ধৃব্যক্তি ঋষিরাজের নাম শ্রবণে ভীতচিত্তে তৎক্ষণাৎ বন্ধন মুক্ত করিয়া দিল এবং তাঁহার পদতলে বিলুণ্ঠিত হইয়া সজল নয়নে স্বীয় অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিল। তাহাতে মহর্ষি কহিলেন, "ভয় নাই, আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যে আমাকে নির্য্যাতন করিয়াছ, তাহা নির্য্যাতন নহে, আমি তাহাতে স্বর্গসুখ ভোগ করিয়াছি। তোমার অমঙ্গল হয়, ইহা আমার অণুমাত্রও অভিপ্রেত নহে।" এই বাক্যে সৈনিক আশ্বস্ত হইয়া পুনঃ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল "হজরত! আপনি 'আমার প্রশ্নের উত্তরে নগরের পরিবর্ত্তে গোরস্থান প্রদর্শন করিয়াছিলেন কি জন্য?" তিনি কহিলেন "দেখ, ক্রমাগত গোরস্থানেরই শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে, এবং নগরের ক্ষয়প্রাপ্তি ঘটিতেছে; নরগণ মৃত্যু অন্তে গোরস্থানেই আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। যখন গোরস্থানের

ক্রমেই উন্নতি,—ক্রমেই লোক তথায় স্থিত হইতেছে, তখন গোরস্থানকে লোকালয় বলিয়া নির্দ্দেশ করা অযৌক্তিক নহে।”

তপোধন এক দিন নদীতীরে বসিয়া আপনার ছিন্ন বস্ত্র সিলাই করিতেছিলেন। সহসা হস্তস্খলিত হইয়া তাঁহার সূচটী জলমধ্যে পড়িয়া যায়। তিনি সূচের জন্য ইতস্ততঃ করিতেছেন, ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সদুঃখে কহে, “হায় কি অনুতাপ! বল্‌খের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া কোন্ ফল-লাভ করিয়াছ? রাজভোগ, রাজপ্রাসাদ, রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া স্ব ইচ্ছায় এ কষ্ট গ্রহণ কেন?” ইব্রাহিম এই বাক্যে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নদীর দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক “আমার সূচ দেহ” বলিয়া চীৎকার করিলেন। কি অপূর্ব্ব তপোবল! ভক্ত-মনোরঞ্জন ভুবনপতির আদেশে অমনি সহস্র সহস্র মৎস্য সূচ মুখে করিয়া জলোপরি ভাসমান হইল। তখন ইব্রাহিম কহিলেন আমি নিজের সূচ চাহি; অপর অসংখ্য সূচে আমার প্রয়োজন কি?” ইহাতে একটী মৎস্য মহর্ষির সূচ মুখাগ্রে ধরিয়া আনিয়া যথাস্থানে স্থাপন করিল। ইব্রাহিম ঈদৃশ অপূর্ব্বরূপে আপনার সূচ পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া সেই ব্যক্তিকে কহিলেন, “বল্‌খের রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই ফলের এই এক নিদর্শন, তুমি প্রণিধান করিয়া বুঝ।”

এক ব্যক্তি মহর্ষিকে জিজ্ঞাসা করেন, “আমি পরমেশ্বরের নিকটে আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি, কিন্তু তিনি আমার মনোভিলাষ পূর্ণ করেন না। ইহার কারণ কি, অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া

আমার ভ্রম ভঞ্জন করুন।” ইহা শ্রবণ করিয়া তপস্বিপ্রবর কহিলেন, “তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হইবে কিরূপে ? সৃষ্টিকর্ত্তার উপর তোমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে বটে, কিন্তু যথানিয়মে তাঁহার সাধনা কর না। তদীয় প্রেরিত শেষ তত্ত্ববাহককে বিশেষরূপে চিনিয়াও তাঁহার বিধানমতে চল না। কোরাণশরিফ পাঠ কর বটে, কিন্তু তাহার অন্তর্নিহিত উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য কর না। প্রতিদিন বিশ্ববিধাতার অনুগ্রহ ভোগ করিতেছ, কিন্তু কৃতজ্ঞতা দেখাও না; আজ্ঞাধীন ব্যক্তিবর্গের জন্য স্বর্গের সৃষ্টি, ইহা জানিয়াও তল্লাভার্থ যত্নবান্ হও না। শয়তানকে ভীষণ শত্রু জানিয়াও তাহার সহিত মিত্রের ন্যায় ব্যবহার করিতেছ। মৃত্যু নিশ্চয়ই হইবে জানিতেছ, তথাপি তাহার জন্য প্রস্তুত থাকিতেছ না। পিতা মাতা-আত্মীয়-স্বজনগণকে নিয়ত কবরস্থ করিতেছ, তথাপি হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় না। আপনার দোষের প্রতি দৃষ্টি কর না, কিন্তু পরের ছিদ্রান্বেষণে সদাই মত্ত থাক। বল দেখি, যে ব্যক্তির আচরণ এইরূপ, তাহার প্রার্থনা কি পূর্ণ হইতে পারে ?”

মহর্ষির এইরূপ শত শত উপদেশ ও জীবনের শত শত ঘটনা বিদ্যমান রহিয়াছে। তৎসমুদয় পাঠে শরীর রোমাঞ্চিত, হৃদয় প্রফুল্ল, ও মন অদ্ভুত রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। শেষ জীবনে তিনি এক স্থানে না থাকিয়া, স্থানে স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া ফিরিতেন। তাঁহার পবিত্র আত্মা দেহ-বন্ধন বিমুক্ত হইয়া কোন্ স্থানে যে স্বর্গ-রাজ্যে প্রস্থান করেন, কোথায় যে

তাঁহার নশ্বর দেহ সমাধিস্থ করা হয়, তাহার স্থিরতা নাই। তবে এক খানি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি জীবনের শেষ ভাগে এসিয়া মাইনরে অবস্থিতি করেন এবং হজরত লুত পয়গম্বরের সমাধির নিকটস্থ এক পর্ব্বত-গুহায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন।

৫। তপস্বী ফজিল আয়াজ।

তপস্বী ফজিল আয়াজ বোগদাদের ভুবনবিখ্যাত মহামান্য খলিফা মহামতি হারুণ অর রসিদের সময়ে প্রাদুর্ভূত হন। তাঁহার প্রকৃত নাম ফজিল, আয়াজ তাঁহার পিতার নাম, কিন্তু তিনি এই উভয় নাম-সম্মিলনে অভিহিত। অলৌকিক তপশ্চর্য্যা, অসামান্য বাঙ্‌নিষ্ঠা, ও অপূর্ব্ব তত্ত্বোপদেশ-প্রদান-ক্ষমতাবলে তিনি জনসমাজে প্রভূত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বয়ং বোগদাদেশ্বর ফজিল আয়াজের অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও তেজস্বিতা দর্শনে এবং মধুর সদুপদেশ শ্রবণে বিমোহিত হইয়া, তাঁহাকে বাস্তবিকই সাধু পুরুষ বলিয়া প্রশংসা-কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম জীবন পুণ্য-পথগত ছিল না। তিনি পরস্বাপহারী ভীষণ দস্যু নামে সর্ব্বত্র পরিচিত ছিলেন, রাহাজানি দ্বারা তাঁহার জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত। পরন্তু সেই উচ্ছৃঙ্খল চৌর্য্যবৃত্তির মধ্যেও তাঁহার মহত্ত্ব, ঔদার্য্য, সহৃদয়তা ও সহানুভূতি বিশদভাবে প্রতিভাত ছিল। তিনি প্রকৃত বীরপুরুষের

ন্যায় শক্তিসাধ্য কার্য্যেই অগ্রসর হইতেন। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার, মহিলাকুলের উপর উৎপীড়ন বা অপর কোন নিন্দনীয় কাপুরুষোচিত কার্য্য তৎকর্ত্তৃক কদাপি অনুষ্ঠিত হয় নাই। যে সকল পথিকের নিকটে অল্প অথবা প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্ব্বাহোপযোগী অর্থাদি থাকিত, তিনি তাহা কখন গ্রহণ করিতেন না। কথিত আছে, ফজিল কোন একটী রমণীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত ছিলেন। দস্যুতা-লব্ধ অর্থাদি তিনি সেই মনোমোহিনীর নিকট প্রেরণ করিতেন এবং বিচ্ছেদের বিষময় হুতাশনে মিলনের সুখকর শান্তিবারি প্রদানার্থ মধ্যে মধ্যে তৎসকাশে উপনীত হইয়া তৃপ্তিলাভ করিতেন।

ফজিল আয়াজ স্বয়ং প্রায় দস্যুকার্য্য করিতেন না। তিনি এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে তাঁবু স্থাপন করিয়া তন্মধ্যে ধর্ম্মপরায়ণ সাধুর বেশে অবস্থিতি করিতেন। হস্তে জপমালা, মস্তকে টুপি ও পরিধানে ঋষি-জনোচিত পরিচ্ছদ ধারণে তিনি নিরন্তর সজ্জিত থাকিতেন। আবার দৈনন্দিন উপাসনারও ব্যতিক্রম ছিল না। প্রতিদিন ইস্‌লাম-শাস্ত্রসঙ্গত পঞ্চ সময়ের নির্দ্দিষ্ট পবিত্র নামাজ যথারীতি সম্পন্ন করিতেন এবং আপনার অধীন অনুচরবর্গকেও তৎপ্রতিপালনে বাধ্য করিয়াছিলেন। যদি কাহারও সে বিষয়ে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হইত, তাহা হইলে ফজিল তাহাকে স্বদল হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতেন।

ফজিলের অনুচরগণ সকলেই দস্যু ছিল। তাহারা সেই প্রান্তরের চতুর্দ্দিকে বিচরণ করিয়া পথিক ও বণিক্‌দলের ধন-

ন করত আপনাদের দলপতির নিকট আনয়ন করিত। দস্যুনেতা ফজিল তৎসমুদয় লুণ্ঠিত দ্রব্য হইতে আপনার অভিলষণীয় অংশ গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট তাহাদিগকে বণ্টন করিয়া দিতেন।

এক দিন এক দল স্থলবণিক্ ফজিলের অধিকৃত প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দস্যুর কবলমধ্যে আসিয়া পড়িয়াছেন, অতঃপর ইহা জানিতে পারিয়া যৎপরোনাস্তি চিন্তাকুল ও বিহ্বল হইলেন। জনৈক চতুর বণিক্ আপনার প্রভূত অর্থ জঙ্গলের কোন নিভৃত স্থানে গুপ্তভাবে রক্ষা করিবার মানসে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সতৃষ্ণ নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সহসা ফজিলের তাঁবু তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বণিক্ হৃষ্টচিত্তে সেই তাঁবুর নিকটবর্ত্তী হইয়া দেখেন, এক জন ধর্ম্মপরায়ণ সাধুপুরুষ জপমালা হস্তে পবিত্র আসনে উপবিষ্ট আছেন। এতদ্দর্শনে বণিক্ অতীব আশ্বস্ত হইলেন; ভাবিলেন, এ ব্যক্তি খোদার দরবেশ, ইহার নিকট গচ্ছিত রাখিলে অর্থের অপচয়ের সম্ভাবনা নাই। ইহা চিন্তা করত তিনি ফজিলের সম্মুখে যাইয়া স্বীয় বিপদের কথা জানাইয়া অর্থ রাখিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। ফজিলও তাঁহাকে তাঁবুর মধ্যে অর্থ রাখিতে বলিলেন। তখন বণিক্ হৃষ্টচিত্তে তাহাই করিয়া আপনার সহগামী বণিক্‌দিগের সকাশে গমন করিলেন। আসিয়া দেখেন, দস্যুগণ তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব ন করিয়া পলায়ন করিয়াছে; সকলের দুরবস্থার একশেষ

হইয়াছে। কেহ ভগ্নপদ, কেহ ছিন্নবাহু, কেহ বা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গে কাতরস্বরে ক্রন্দন করিতেছে। চতুর বণিক্ ঈদৃশ দুরবস্থার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন এবং তদীয় অর্থরাশি রক্ষিত হইয়াছে, ভাবিয়া আপনাকে ভাগ্যবান্ বিবেচনা করত জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন।

অতঃপর দস্যুগণ সকলেই চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া, বণিক্ আপনার রক্ষিত অর্থ গ্রহণার্থ তাঁবুর অভিমুখে গমন করিলেন। কিন্তু যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রাণ উড়িয়া গেল, ভয়ে সর্ব্বাঙ্গ স্বেদার্দ্র হইল, আর অগ্রসর হইতে পা উঠিল না। তিনি দেখিলেন, তাঁহাদেরই লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি দস্যুগণ তাঁবুর মধ্যে বিভাগ করিয়া লইতেছে; স্বয়ং সেই দরবেশ বণ্টন করিতেছেন। কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মপরায়ণ সাধু পুরুষ কি কখন এইরূপ অসদাচরণে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? কখনই না। বণিক্ বুঝিলেন, এই দরবেশ বাস্তবিক দরবেশ নহে,—এই দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদলের নেতা। লোকের বিভ্রম ঘটাইবার জন্য কপট সাধুর বেশ ধারণ করিয়াছে। তখন দারুণ অনুশোচনায় বণিকের অন্তরাত্মা পুড়িতে লাগিল; কহিলেন, "হায়, হায়, আমি সাধ করিয়া দস্যু-করে ধন তুলিয়া দিলাম। সাধুভ্রমে অধার্ম্মিক খলের সেবা করিলাম!! অমৃতজ্ঞানে হলাহল পান করিলাম!!" এইরূপ অনুতাপ করিতেছেন, ইত্যবসরে ফজিল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া নিকটে আসিতে অনুমতি করিলেন। ফজিলের উচ্চ আহ্বানে বণিক্ আপনাকে আরও বিপদাপন্ন বোধ করিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডল শুকাইয়া

গেল, বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। কি করিবেন ? কম্পিত কলেবরে ধীরপদে তথায় উপস্থিত হইলেন। ফজিল তাঁহাকে কহিলেন, "তুমি কি জন্য এখানে আসিয়াছ ?" বণিক্ সাহসে নির্ভর করিয়া উত্তর করিলেন, "আমার অর্থ লইবার জন্য।" ফজিল কহিলেন, "যথাস্থানে আছে, গ্রহণ কর ; কোন চিন্তা নাই।" এই অভয়বাণী শ্রবণ করিয়া বণিক্ আপনার রক্ষিত অর্থ গ্রহণপূর্ব্বক মহানন্দে যাইয়া আপনার সঙ্গীদিগের সহিত সম্মিলিত হইলেন।

ফজিলের অনুচরগণ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া কহিল, "আজিকার লুণ্ঠনে একটীও টাকা হস্তগত হয় নাই ; ইহা দেখিয়াও তুমি কি জন্য এই সমস্ত অর্থ হাতে পাইয়া অবলীলাক্রমে ছাড়িয়া দিলে ?" ফজিল তাহাদিগকে কহিলেন, "ভ্রাতৃগণ ! এই বণিক্ আমাকে সদাশয় জ্ঞানে বিশ্বাস স্থাপন করত অর্থ গচ্ছিত রাখিয়াছিল, সুতরাং আমিও তাহার সেই বিশ্বাস অটল ও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য বিধাতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই কার্য্য করিলাম।" ইহা শুনিয়া তাহারা নিস্তব্ধভাব ধারণপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করিল।

অপর এক দিবস নীচাশয় দস্যুরা এক দল বণিকের উপর আপতিত হইয়া তাঁহাদের যাবতীয় অর্থ-সামগ্রী লুণ্ঠন করিয়া লয়। এই বণিক্‌দলের এক ব্যক্তি জনৈক দস্যুর নিকটে আসিয়া কহেন, "তোমাদের মধ্যে প্রধান কে ?" দস্যুরা কহিল, "তিনি তরঙ্গিণীর তীরে নামাজে নিবিষ্ট আছেন।" বণিক্ বলিলেন, "নামাজের সময় এখনও ত উপস্থিত হয় নাই। তবে এ কি

প্রকার নামাজ করিতেছেন!” তাহারা বলিল, “আমাদের দলপতি নফল (অতিরিক্ত) নামাজ পড়েন।” বণিক্ পুনর্ব্বার কহিলেন, “আচ্ছা, তিনি আহার করেন কখন?” তাহারা কহিল, “তিনি রোজা-ব্রত অবলম্বন করেন বলিয়া দিবসে আহারে বিরত থাকেন।” বণিক্ কহিলেন, “এ কি প্রকার রোজা? আমি ত বুঝিতে পারিতেছি না। এত রমজান মাস নহে।” “তিনি নফল (অতিরিক্ত) রোজা পালন করেন।” দস্যুদের পুনঃ এই উত্তর শুনিয়া বণিক্ অতীব আশ্চর্য্য জ্ঞান করিলেন এবং তৎ-ক্ষণাৎ ফজিলের সমীপে উপস্থিত হইয়া দস্যুদের বাক্যের সত্যতার প্রমাণ প্রাপ্ত হইলেন;—দেখিলেন ফজিল নামাজে দণ্ডায়মান আছেন। কি অসম্ভব অদ্ভুত ব্যাপার! বণিকের বিস্ময়ার্ণব আরও স্ফীত হইয়া উঠিল, অপলক নয়নে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর নামাজ সাঙ্গ হইলে তিনি ফজিলকে সম্ভাষণ-পূর্ব্বক কহিলেন “নামাজ ও রোজার মধ্যে চৌর্য্যবৃত্তি! ইহা কি কর্ত্তব্য!” ফজিল এই প্রশ্ন শুনিয়া কহিলেন, “আপনি কি পবিত্র কোরাণশরিফ পাঠ করিয়াছেন?” বণিক্ কহিলেন, “হাঁ, দয়াময়ের অনুগ্রহে আমি তাহা অবগত আছি।” তখন ফজিল ঈষৎ হাস্য সহকারে কহিলেন, “তবে কি আপনি এই আয়েত (শ্লোক) অবগত নহেন যে, (লোকে) আপনার পাপকে স্বীকার করিয়াছে এবং সৎকার্য্যকেও তাহার সামিল করিয়া লইয়াছে।” ইহা শ্রবণ করিয়া বণিক্ বিস্ময়-বিহ্বল-চিত্তে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপ প্রণালীক্রমে তাহাদের দস্যুক্রিয়া চলিয়া আসিতেছিল। ফলতঃ দস্যুরাজ ফজিলের ও তৎসহচরগণের নামে লোক মহাতঙ্কে সেই প্রান্তর পরিত্যাগ করিয়াছিল। "দস্যু ফজিল" এই কথা শুনিলেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রাণ উড়িয়া যাইত। কিন্তু লীলাময় জগদীশ্বরের কি অপার মহিমা! কি অনমুমেয় অপূর্ব্ব কৌশল!! যে নাম লোকের অন্তরে বিজাতীয় ভীতির সঞ্চার এবং বিসদৃশ অবজ্ঞা ও অতীব ঘৃণার উদ্রেক করিয়া আসিতেছিল, যে নাম শ্রবণে লোকে সংজ্ঞাহারা হইয়া আকুল হৃদয়ে কাঁদিয়া উঠিত, সেই নামই আবার জগতের ভক্তি, ভালবাসা, স্নেহ, অনুরাগ আকর্ষণ করিতে প্রস্তুত হইতে চলিল। সাধারণে সেই নাম শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণ করিয়া যে নির্ম্মল আনন্দানুভব করিবে, দৈবানুগ্রহে তাহার শুভ সুযোগ সমুপস্থিত হইল। প্রিয় পাঠক! বিস্মিত হইবেন না, যিনি বিচিত্র ক্ষমতাবলে অন্ধকারময় খনির গর্ভে মণি, জলধি-উদরস্থ শুক্তি মধ্যে মহামূল্য মুক্তা এবং ইঙ্গিতে আরও কত বিস্ময়কর ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়া জগৎকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই অনন্ত মহিমাময়ের কৃপা-পারাবারের বিন্দুবারিপাতে ভীষণত্বে মাধুর্য্যের সমাবেশ হইবে এবং পাপপঙ্কিল মলিন হৃদয় ধর্ম্মের উজ্জ্বল আলোকে উজ্জ্বল ও পবিত্র হইয়া স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে!

একদা নিশীথ সময়ে এক দল স্থলবণিক্ আপনাদের মূল্যবান বাণিজ্য দ্রব্য সহ ঘটনাক্রমে সেই প্রান্তরে আসিয়া সমুপস্থিত

হন। দস্যুদলপতি ফজিল যে স্থানে অবস্থান করিতেন, তাঁহারা নিরাপদে যামিনী যাপনার্থ ঠিক তাহার সম্মুখভাগে আসিয়া তাঁবু স্থাপন করিয়াছিলেন। জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহারা দস্যুর কবলমধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। যাহা হউক, বণিক্‌গণ নিরাতঙ্ক! কেহ নিদ্রিত, কেহ জাগরিত, কেহ বা প্রহরীর কার্য্যে নিয়োজিত থাকিয়া চতুর্দ্দিকের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণে নিরত। প্রান্তর নীরব—নিস্তব্ধ! এই সময়ে জনৈক ধর্ম্মভীরু বণিক্ মধুরকণ্ঠে পবিত্র কোরাণশরিফ পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সেই কোমল কণ্ঠের কমনীয় ধ্বনি যামিনীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সুধা বর্ষণ করিয়া প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল। পাঠকের উচ্চারণ-পদ্ধতি যেমন উচ্চ, বিশুদ্ধ ও মার্জ্জিত, কণ্ঠস্বরও তেমনি সুললিত, শ্রবণরঞ্জন ও মনের উল্লাস-সাধক! দস্যুদলপতি ফজিলের অন্তঃকরণ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে সেই দিকে প্রধাবিত হইল, অমনি তাঁহার কাঠিন্য-স্ফীত হৃদয় দমিত হইয়া কোমল ভাব ধারণ করিল। তিনি মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় কর্ণ পাতিয়া অনন্যমনে সেই স্বর-লহরী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে "হে নিদ্রিত! আল্লার ভয়ে জাগরিত হইবার সময় কি তোমার এখনও উপস্থিত হয় নাই?" এইরূপ অর্থবোধক একটী শ্লোক তদ্দীয় কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সেই শ্লোক সুতীক্ষ্ণ বিষবাণের ন্যায় তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিল; তিনি ভীতচিত্তে কাঁপিয়া উঠিলেন। সহসা চেতনার সঞ্চার হওয়ায় তাঁহার জ্ঞানচক্ষু বিকশিত হইল; দেখিলেন, এই দীর্ঘ কাল কি

ভয়ানক কুকার্য্যেই তিনি জীবনাতিবাহিত করিয়াছেন। তখন অনুশোচনার তীব্র অঙ্কুশ-তাড়নে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না ; সহচর দস্যুদিগকে ত্যাগ করিয়া সাশ্রুলোচনে, লজ্জাবনতবদনে উন্মত্তের ন্যায় আর্ত্তনাদ করিতে করিতে গভীর অরণ্যমধ্যে দ্রুত দৌড়িতে লাগিলেন। সম্মুখে দেখিলেন, আর এক দল বণিক্ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিতেছে। তাহারা পরস্পর বলিতেছে, "দস্যু ফজিল সম্মুখে আছে, তাহার পাশব অত্যাচারে এই পথ অতি দুর্গম হইয়া পড়িয়াছে ; সুতরাং এই পথে আমাদের কোনক্রমেই যাওয়া উচিত নহে।" এই কথা শ্রবণে ফজিল আরও সন্তপ্ত হইলেন এবং দুঃখকম্পিত উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, ভ্রাতৃগণ! আর ভয় নাই, "ভয় নাই, আজ আমি তোমাদিগকে সুসমাচার প্রদান করিতেছি, সেই নরাধম ফজিল কৃতাপরাধের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে এবং জগদীশ্বরের নামে শপথ করিয়া পাপের কার্য্যে চিরবিরত হইবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে। তোমরা যেমন তাহার কবল হইতে পলাইবার চেষ্টা করিতেছে, সেও তেমনি আজ তোমাদের সম্মুখ হইতে পলাইয়া যাইতেছে। সন্দেহ করিও না ; তোমরা নির্ভয়চিত্তে আপনাদের গন্তব্য পথে অগ্রসর হও।" ইহা বলিয়া তিনি রোদন করিতে করিতে আবার ধাবিত হইলেন।

এইরূপ অবস্থায় তিনি ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সম্মুখে যাহাকে দেখিতে পান, তাহারই নিকট স্বীয় কৃতাপরাধের জন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অনন্তর একদা কোন

এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে জগদীশ্বরের শপথ দিয়া করুণকণ্ঠে কহিলেন "ভ্রাতঃ! আমাকে ধৃতকরণার্থ মহামান্য বাদশাহের ঘোষণা আছে। আমি তাঁহার প্রভূত শাস্তির পাত্র। অতএব তুমি আমার হস্তপদ বন্ধন করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া চল, আমি তাঁহার সেই সমুচ শাস্তি এক্ষণে গ্রহণ করিব;" এইরূপ সানুনয় অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া সেই ব্যক্তি ফজিলকে বাদশাহের দরবারে লইয়া গেল। বিচক্ষণ বাদশাহ তাঁহার মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিবামাত্র বুঝিলেন যে, ফজিলের পূর্ব্বভাব আর নাই; তাঁহার অন্তর বিশোধিত হইয়াছে, কদাচারময় পাপপথ পরিবর্জ্জন করিয়া এক্ষণে তিনি ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। তখন নরপতি হৃষ্টান্তরে ফজিলকে সম্মানের সহিত বাড়ী পাঠাইয়া দিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। বাদশাহের তত্ত্বাবধানে অবশেষে ফজিল স্বভবনে আসিয়া উপস্থিত। তিনি গৃহ-প্রাঙ্গণে পদার্পণ করিতেই তাঁহার আত্মীয়বর্গ কহিল, "আজ তোমাকে ঈদৃশ ম্রিয়মাণ দেখিতেছি কেন? বেশভূষা শৃঙ্খলা-রহিত, কণ্ঠস্বর ভগ্ন, এবং নয়নজলে বক্ষঃ প্লাবিত। তবে কি তুমি গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হইয়া কাতর হইয়াছ?" ফজিল কাতরভাবে উত্তর করিলেন, "হাঁ! আজ ভয়ানক আঘাতই পাইয়াছি?" তাহারা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "কোথায় লাগিয়াছে?"—"প্রাণে লাগিয়াছে, সে আঘাতের আর ঔষধ নাই।" এই কথা বলিয়া গৃহমধ্যে গমন করিয়া সহধর্ম্মিণীকে কহিলেন, "আমি এক্ষণে পবিত্রধাম মক্কাগমনাভিলাষী।"

তখন সেই পতিপ্রাণা পুণ্যবতী কামিনী কহিলেন, "আমি তোমা হইতে পৃথক্ হইয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে প্রস্তুত নহি। তুমি যেখানে যাইবে, আমিও সুখে দুঃখে সেই স্থানে তোমার নিকট থাকিয়া, তোমার পদ সেবা করিয়া জীবন সার্থক করিব, ইহাই আমার চিরসঙ্কল্প, ইহাই আমার বাসনা। এক্ষণে তোমার যাহা অভিরুচি, তাহাই কর।" এই সন্তোষজনক উত্তর পাইয়া তিনি পত্নী-সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে মক্কাযাত্রা করিলেন; করুণাময় বিশ্ব-পাতা তাঁহাকে সৎপথের পথিক করিলেন।

পুণ্যক্ষেত্র মক্কায় আসিয়া ফজিল আয়াজের প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইল। দস্যুজীবনে বণিক্‌মুখে মুক্তিপ্রদ কোরাণের পবিত্র উক্তি শ্রবণে তাঁহার অন্তরে যে বৈরাগ্যানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা সুফল প্রসব করিল। তিনি মক্কা-ধামে বহুসংখ্যক সাধু সহবাসে, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক-কুলশিরোমণি ইমামশ্রেষ্ঠ মহাত্মা হজরত আবু হানিফার নিকট দীর্ঘ কাল থাকিয়া প্রভূত জ্ঞানসম্পন্ন, সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও আধ্যাত্মিক উপাসনায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন। শাস্ত্রবিধির সূক্ষ্ম সূত্র ধরিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ধর্ম্মকর্ম্ম প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। তিনি নিয়ত নির্জ্জনে খোদাচিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিতেন এবং পূর্ব্ব অপরাধ স্মরণ করিয়া বিরসবদনে সেই পরাৎপরের নিকট ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেন। তাঁহার অসাধারণ ন্যায়নিষ্ঠা, অবিশ্রান্ত ধ্যানধারণা ও অলৌকিক ধর্ম্মভীরুতা দর্শনে মক্কাবাসী সকলেই মুগ্ধ হইলেন। সকলেই তাঁহাকে সম্মান ও

সমাদর প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অমৃতময় ধর্ম্মো-পদেশ শ্রবণজন্য লোকে লোকারণ্য হইত। অচিরকাল মধ্যেই তিনি "মহর্ষি ফজিল আয়াজ" এই গৌরবাত্মক নামে সর্ব্বত্র খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিলেন। অবশেষে এরূপ ঘটিল যে, সেই শাস্ত্রপারদর্শী পণ্ডিতপূর্ণ নগরীতে তিনি উপদেশ-কের পদে উপবিষ্ট হইলেন। আহা, নশ্বর মানবজীবনে এতদপেক্ষা সুখ ও সৌভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? এইরূপে এক জন অপকর্ম্মরত পথভ্রান্ত পুরুষ ধর্ম্মরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া আশ্চর্য্যরূপ ধর্ম্মজীবন প্রাপ্ত হইলেন; জগতের চিরপূজনীয় মহাত্মা নামে পরিকীর্ত্তিত হইলেন। অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! ধর্ম্মের কি অপার মহিমা!! লীলাময় আল্লাহতালার কি অপূর্ব্ব লীলা!!!

কিয়দ্দিবস পরে ফজিলের পূর্ব্ব সহচরগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করণার্থ মক্কায় আসিয়া উপনীত হইল। কিন্তু তিনি তাহাদিগকে আপনার বাটীতে আসিতে দিলেন না এবং তাহারাও তাঁহার নিষেধবাক্য শ্রবণে আর অগ্রসর না হইয়া বহির্ভাগেই দাঁড়াইয়া রহিল। তখন ফজিল আপনার বাস-ভবনের ছাদে উঠিয়া দণ্ডায়মান হইয়া বলিতে লাগিলেন, "ভ্রাতৃগণ! করুণাময় জগদীশ্বর তোমাদিগকে সুমতি দিয়া আপনার কার্য্যে বিমুগ্ধ রাখুন। আমার দিকে মুখ ফিরাইলে কি হইবে? সত্যের দিকে বদন ফিরাও, উভয় কালের বাসনা পূর্ণ হইবে, মনোমত ধন প্রাপ্ত হইবে।" আগন্তুকগণ এতচ্ছ্র-

বণে অতীব ম্রিয়মাণ হইল এবং হতাশ হৃদয়ে অনুতাপ করিতে করিতে আপনাদের গন্তব্য স্থান খোরাসানের দিকে প্রস্থান করিল।

সুলতান হারুণর রসিদের প্রতি ফাজিলের উপদেশ।

একদা রাত্রিকালে মহামান্য সুলতান হারুণর রসিদ আপনার জনৈক প্রিয় পারিষদকে কহিলেন, "অদ্য আমাকে কোনও ধর্ম্মব্রত সাধু পুরুষের সংসর্গে লইয়া চল। জঞ্জালময় রাজকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া আজ আমার অন্তর অতীব উদ্বিগ্ন হইয়াছে; সাধু লোকের সুখ-সংসর্গে কিছুক্ষণ থাকিয়া জীবনে শান্তিলাভ করিব, এই আমার বাসনা।" ইহা শ্রবণানন্তর পারিষদ বাদশাহকে লইয়া তাপস সুফিয়ানের গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। যথাসময়ে তথায় উপনীত হইয়া দ্বারদেশে করাঘাত করিতেই সুফিয়ান কহিলেন, "কে তুমি দ্বারে আঘাত করিতেছ?" পারিষদ উত্তর করিলেন, "খলিফা হারুণর রসিদ উপস্থিত।" তখন সুফিয়ান ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কহিলেন, "ভ্রাতঃ! এ সংবাদ তুমি অগ্রে আমাকে না কহিলে কেন? তাহা হইলে আমি স্বয়ংই তাঁহার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইতাম।" বিচক্ষণ নরপতি হারুণর রসিদ তপস্বীর মুখে এই দুর্ব্বলতার কথা শুনিয়া পারিষদকে ক্ষুণ্ণভাবে বলিলেন, "আমি যে ব্যক্তির সহবাসলাভার্থ অনুসন্ধান করিতেছি, আমার সেই অভিলষিত ব্যক্তি ইনি নহেন।" সুফিয়ান এতচ্ছ্রবণে

কহিলেন, "আপনারা যেরূপ লোকের দর্শনাভিলাষী, এখন আমি বুঝিলাম, তিনি মহর্ষি ফজিল আয়াজ ব্যতীত অপর কেহই নহেন।"

অনন্তর বাদশাহ পারিষদ সহ ফজিল আয়াজের ভবনে উপনীত হইলেন। এই সময়ে ঋষিরাজ গৃহমধ্যে "মন্দমতিরা কি অবধারণ করিয়া লইয়াছে যে, তাহাদিগকে ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিবর্গের সহ গ্রহণ করিব?" পবিত্র কোরাণের এইরূপ ভাবাত্মক একটী আয়েত পাঠ করিতেছিলেন। পুণ্যপুরুষ হারুণর রসিদ তৎশ্রবণে কহিলেন, "বাসনা সফল হইল; যদি কোন উপদেশ শ্রবণের প্রয়োজন হয়, তবে ইহাই যথেষ্ট।" পরে দ্বারের উপর করাঘাত করিলে মহর্ষি বলিলেন, "কে তুমি?" পারিষদ উত্তর করিলেন, "বোগদাদেশ্বর হারুণর রসিদ।" ফজিল বলিলেন, "বাদশাহের আমার নিকট কি কার্য্য আছে? এবং আমিই বা তাঁহার নিকটে কোন্ কার্য্যের প্রয়াসী? আমি বারংবার বলিতেছি, আমাকে অনর্থক বাক্‌বিতণ্ডায় নিমগ্ন করিও না।" পারিষদ বলিলেন, "যিনি মহামান্য খলিফা, ইসলামের রক্ষক ও ধার্ম্মিকমণ্ডলীর আশ্রয়, তাঁহার আনুগত্য স্বীকার ও সম্ভ্রম রক্ষা করা কি কর্ত্তব্য নহে?" ফজিল বলিলেন "আমাকে ক্লেশ দিও না, বিরক্ত করিও না।" পারিষদ পুনর্ব্বার কহিলেন, "আমি বাদশাহের অনুমতিক্রমেই তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিয়াছি।" ফজিল বিরক্তির সহিত বলিলেন, "বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি? তাঁহার

ত এখানে আসিবার আজ্ঞা হয় নাই। তবে তিনি ইচ্ছা করিলে এস্থলে আসিতে পারেন।” তখন বাদশাহ ফজিলের সমীপস্থ হইলেন। তাপসপ্রবর বাদশাহকে আসিতে দেখিয়াই প্রদীপ নির্ব্বাপিত করিয়া দিলেন, কেননা তিনি তাঁহার মুখাবলোকন করিবেন না, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন।

বোগদাদেশ্বর সেই অন্ধকারময় তাপস-কুটীরে প্রবিষ্ট হইলেন। দৈবক্রমে তাঁহার হস্ত ঋষিরাজের হস্তের উপর পতিত হইল। ইহাতে ফজিল বলিলেন, “হস্তখানি অতি সুন্দর ও কোমল বটে, কিন্তু ইহা নরকের ভীষণ হুতাশন হইতে পরিত্রাণ পাইলেই মঙ্গল।” এই উক্তির পরেই তিনি নামাজ নির্ব্বাহার্থ উঠিয়া দাঁড়াইলেন; বাদশাহ হতাশের দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে বিষম ভয়ের উদ্রেক হইল; নয়নজলে বুক ভাসিয়া গেল। নামাজ সাঙ্গ হইলে মহর্ষিকে কহিলেন, “যাহাতে পরলোকে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে কিছু উপদেশ দিউন।” তপোধন বলিতে আরম্ভ করিলেন, “দেখুন আপনার পিতামহ হজরত মহম্মদ মস্তফার পিতৃব্য ছিলেন। তিনি তাঁহাকে কোনও প্রদেশের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিয়া দিবার জন্য হজরতকে জানাইয়াছিলেন। তাহাতে হজরত তাঁহাকে বলেন, “আমি আপনাকে আপনার মনোরাজ্যের অধিপতি করিলাম; আপনি তাহা সৃষ্টিকর্ত্তার আনুগত্য প্রাপ্তির দিকে চালনা করুন। সহস্র বৎসরের পৃথিবীর

শাসনকর্ত্তৃত্ব লাভের অপেক্ষা ইহা কি আপনার পক্ষে উত্তম ও উপযুক্ত নহে?" হারুণর রসিদ ইহা শুনিয়া পুনঃ বলিলেন, "আরও কিছু উপদেশ দিউন।" তপস্বী বলিলেন, "ওমর-তনয় আবদুল আজিজ খলিফা হইয়া রাজ্যস্থ তিন জন জ্ঞানী ব্যক্তিকে আহ্বান করিয়া আনিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে এক জন ধর্ম্মভীরু মহাত্মা এইরূপ সৎ পরামর্শ দেন যে, যদি শেষবিচার দিনে শাস্তির হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইতে চান, তাহা হইলে এইরূপ কার্য্য করুন—বৃদ্ধদিগকে পিতৃবৎ, যুবাগণকে ভ্রাতার সদৃশ, বালকবৃন্দকে পুত্রের তুল্য এবং মহিলামণ্ডলীকে মাতা বা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিয়া যথাবিধি সদয় ব্যবহার করুন। যাহাতে তাহাদের কুশল সাধিত হয়, তাহাই করিতে থাকুন।" ফজিল ইহাই বিবৃত করিয়া পুনর্ব্বার বাদশাহকে বলিলেন, "কিন্তু আমার ভয় হইতেছে, পাছে আপনার মনোহর চন্দ্রবদন নরকানলে ভস্মীভূত হইয়া যায়। কেননা অনেক চাঁদমুখ সেই অগ্নিতে ছারখার হইয়া যাইবে। অনেক বাদশাহ আপনাদের গুরুতর দায়িত্বের হিসাব দিতে অসমর্থ হইয়া বন্দী হইবে।" এই কথা শুনিয়া হারুণর রসিদ হাহাকার রবে কাঁদিতে লাগিলেন।

মহর্ষি আবার বলিলেন, "অন্তরে খোদার ভয় রাখিও, স্বীয় দায়িত্বের জন্য সতর্ক থাকিও। শেষ বিচারদিনে তন্ন তন্ন করিয়া তোমার হিসাব গৃহীত হইবে। সেই সূক্ষ্মদর্শী বিচারপতি সেই

মহাবিচার-সভায় তুমি প্রকৃতিপুঞ্জের কিরূপ বিচার করিয়াছ, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহা জিজ্ঞাসা করিবেন। আজ যদি কোন বৃদ্ধা আহারাভাবে কষ্টে কালযাপন করে, তবে কল্য সে তোমার হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বিচারপ্রার্থী হইবে; তোমাকে অভিশাপ দিবে।" ইহা শুনিয়া খলিফা হারুণর রসিদ উন্মত্তের ন্যায় আবার এরূপ রোদন করিতে লাগিলেন যে, তিনি অবসন্ন ও চৈতন্যরহিত হইয়া পড়িলেন। তদ্দৃষ্টে পারিষদ ফজিলকে কহিলেন, "আপনি আমিরুল মুমেনিন মহাত্মা হারুণর রসিদের প্রাণ-সংহার করিলেন?" তপস্বী কহিলেন, "হামান! তুমি চুপ করিয়া থাক, বিপরীত কথা বলিতেছ কেন? তুমি এবং তোমার জাতি ইঁহাকে নষ্ট করিয়াছে।" বাদশাহ অতঃপর শোকোচ্ছ্বাসিত প্রাণে পারিষদকে কহিলেন, "ঋষিরাজ, তোমাকে হামান বলিয়াছেন, তাহার কারণ আমাকে ফেরাউন জ্ঞান করিয়াছেন।" অনন্তর বিনীতভাবে সাধুবরকে বলিলেন, "আপনি কি কাহার নিকট ঋণগ্রস্ত আছেন?" তিনি উত্তর দিলেন, "হাঁ, আমি খোদার নিকট ঋণজালে জড়িত আছি। যদি তজ্জন্য আমার অপরাধ সিদ্ধান্ত হয়, তবে সহস্র অনুতাপের কথা।" ইত্যাকার কথোপকথনের পর খলিফা এক সহস্র টাকা ফজিলের সম্মুখে ধারণপূর্ব্বক কহিলেন, "ইহা-পবিত্র ও বৈধ (হালাল) অর্থ, পিতার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি, গ্রহণে চরিতার্থ করুন।" তিনি বলিলেন, "এত উপদেশ সকলই বৃথা হইল। আমার বাক্যের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে না;

অধিকন্তু আমার উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে! আমি তোমাকে পরিত্রাণের পথে লইয়া যাইতে চাই, আর তুমি আমাকে বিপন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছ! তোমার যাহা আছে, প্রকৃত প্রার্থী,—যাহারা পাইবার যোগ্য, তাহাদিগকে প্রদান কর। আমাকে দিলে কোন ফলই নাই।" ইহাই বলিয়া তপোধন দণ্ডায়মান হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাদশাহকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহমধ্যে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিলেন। খলিফা হারুণর রসিদও ফজিলের ন্যায়নিষ্ঠা ও তেজস্বিতা দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত ও মুগ্ধ হইয়া সহস্রমুখে তদীয় যশ কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রাসাদাভিমুখে চলিলেন।

একদা তপস্বী আপন পুত্রকে কোলে লইয়া সস্নেহে আদর-আহ্বান করিতেছিলেন। সহসা পুত্র পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা! তুমি কি আমারে ভালবাস?" তিনি কহিলেন, "আমি তোমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবাসি।" পুত্র আবার বলিল, "খোদাকে ভালবাস?" তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ খোদাকেও ভালবাসি?" তখন ফজিলতনয় পুনর্ব্বার কহিল, "এক মনে দুই জনের ভালবাসা স্থানলাভ করিতে পারে কি প্রকারে? একই স্থানে দুইটী বস্তুর অস্তিত্ব অসম্ভব।" তাপসরাজ এই কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বুঝিলেন, "নিঃসন্দেহ ইহা খোদার খেলা। সেই নিখিলনাথ কর্ত্তৃক প্রবুদ্ধ হইয়াই শিশু এ কথা বলিতেছে; ইহা তাঁহারই উক্তি; আমি চৈতন্য পাইলাম।" ফজিল ইহাই

স্থির করিয়া পুত্রকে ভূমিতে নিক্ষেপ করত ধ্যাননিরত হইলেন।

এক দিন আরফাতের প্রান্তরে ফজিল আয়াজ দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি তত্রত্য সমবেত লোকদিগের প্রার্থনাজনিত ক্রন্দন-কাতরতা শুনিয়া কহিলেন, "হে জগন্নিধান! ইহারা যদি এইরূপে কোন কৃপণ ব্যক্তির নিকটেও যাইয়া অর্থাদি যাচ্‌ঞা করিত, তাহা হইলে সে উহাদিগকে বঞ্চিত করিত না। কিন্তু তুমি দয়ালু ও পরমদাতা; তোমার তুল্য কেহ দাতা নাই। যদি ইহাদের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাদৃষ্টি কর, তবে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। আমার ভরসা আছে, তুমি ইহাদিগকে মার্জ্জনা করিবে।"

এক দিবস রাত্রিকালে সুফিয়ান সুরী ফজিলের ভবনে যাইয়া দেখেন যে, তিনি পবিত্র কোরাণশরিফ ব্যাখ্যা করিতেছেন। সুফিয়ান তথায় উপবেশনান্তর ব্যাখ্যা শ্রবণে পরিতৃপ্ত হইয়া কহিলেন, "আজিকার রাত্রি অতি সুখময়ী, সুপবিত্রা ও মঙ্গলদায়িনী,—আপনার সংসর্গ-সুখে কাটাইলাম।" ফজিল কহিলেন, "এই রাত্রির ন্যায় অশুভ রাত্রি আর নাই।" সুফিয়ান বলিলেন, "কেন? এ রজনী মন্দ কি জন্য? বুঝাইয়া বলুন।" তখন মহর্ষি কহিলেন, "কারণ, সমস্ত রজনী শাস্ত্রালাপে অতিবাহিত হইয়া গেল। তুমি আমার মনস্তুষ্টি সাধনোদ্দেশে যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছ, আমি তাহা হৃষ্টচিত্তে শ্রবণ করিতেছি এবং কিরূপে তোমার প্রশ্নের সদুত্তর দিব, এই

চিন্তাতেই নিমগ্ন থাকিয়াছি। কিন্তু প্রকৃত কার্য্য হইতে অপসারিত হইয়াছি,—এই বাদানুবাদে খোদা-চিন্তা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। সুতরাং এরূপ সংসর্গে সুপ্রসঙ্গে লিপ্ত থাকার অপেক্ষা একাকী নিভৃত স্থানে থাকিয়া পরাৎপরের ধ্যানমগ্ন হওয়া সহস্রাংশে উত্তম ও প্রার্থনীয়। তাই বলিতেছি, এই রজনী অতি অশুভ, সময় বৃথা নষ্ট হইয়াছে।"

উন্নত জীবন মহাত্মা ফজিল আয়াজের ক্রিয়াকলাপ এইরূপ অতি আশ্চর্য্য ও অলৌকিক; পাঠে চমকিত ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়! তিনি প্রার্থনা কালে বলিতেন, "হে বিশ্বনিয়ন্তা ভবপতি! তুমি আমাকে ও আমার পরিজনবর্গকে নিরন্ন ও বিবস্ত্র করিয়া রাখিয়াছ; রাত্রিতে আলোকও দেও না। যাঁহারা তোমার প্রেমিক, তুমি যুগে যুগে তাঁহাদেরই সহিত ঈদৃশ আচরণ করিয়া থাক। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, হে করুণাময়! আমার কি এমন গুণ আছে যে, তৎপ্রভাবে আমি এই সুখৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলাম।"

এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, ফজিলকে ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত কেহ হাস্য করিতে দেখে নাই। পরে যখন তাঁহার প্রিয়পুত্র মানবলীলা সংবরণ করেন, সেই দিন তাঁহার মুখমণ্ডল হাস্যালোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল। তদ্দর্শনে কেহ কেহ তাঁহাকে কহেন, "এই কি তোমার হাসিবার সময়। আর এত দিন পরে আজ এ হাসির উদ্দেশ্যই বা কি?" তাহাতে তিনি উত্তর করেন, "আমি বুঝিলাম, আমার এই প্রিয় পুত্রের মৃত্যুতে

খোদার সম্মতি আছে। অগত্যা আমিও হাস্য করিয়া তাঁহার সম্মতিতে স্বীয় সম্মতি জ্ঞাপন করিলাম। তিনি যাহাতে সন্তুষ্ট, আমার কি তাহাতে অসন্তোষ প্রকাশ করা উচিত ?"

মহর্ষির দুইটী দুহিতা বিদ্যমান ছিলেন। মৃত্যু সন্নিকট হইলে তিনি স্ত্রীকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "মৃত্যুর পরে আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনান্তে তুমি কুমারী দুইটাকে লইয়া আবু কবিস পর্ব্বতোপরে গমন করিবে। তথায় আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ আমারই কথায় কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিবে "হে করুণাময় দীনবন্ধো! আমি জীবিত কাল পর্য্যন্ত যথাশক্তি ইহাদের লালন পালন করিয়াছিলাম; এখন আমি বন্দী, কবর-কারাগৃহে তুমি আমাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ, সুতরাং এই নিরাশ্রয়াদিগকে তোমারই করে সমর্পণ করিলাম।" ফজিলরমণী স্বামীর পরলোক প্রাপ্তির পর পর্ব্বতে যাইয়া এই উপদেশানুসারে কার্য্য করিলেন। তাঁহার করুণ ক্রন্দনে এবং প্রার্থনার কাতরতায় সেই স্থান শব্দায়মান হইয়া উঠিল। এদিকে ভক্তরঞ্জন ভুবনপতিও নিশ্চিন্ত নহেন, তাঁহারই কৌশলক্রমে এয়মনের বাদশাহ আপনার দুই তনয় সমভিব্যাহারে তথায় উপনীত হইলেন। তিনি সেই আর্ত্তনাদ শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসু হইলে ফজিল-সহধর্ম্মিণী একে একে তাবৎ বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন। এয়মনেশ্বর তচ্ছ্রবণে নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং দয়ার্দ্র হইয়া অভয় দানে কহিলেন, "এই দুই কন্যার সহিত আমার দুই পুত্রের বিবাহ দিতে বাসনা করি।" রমণী

তাহাতে সহর্ষে সম্মতি প্রদান করিলেন। অনন্তর বাদশাহ পরম যত্নে তাঁহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া রূপলাবণ্যবতী ফজিলাত্মজাদ্বয়ের সহিত মহাধুমধামে স্বীয় পুত্রযুগলের পরিণয়-কার্য্য সম্পন্ন করিলেন।

এই তেজস্বী তাপস ১৮৭ হিজরী সালের রবিওল আওল মাসে পরলোকগমন করেন এবং পুণ্যভূমি মক্কার জিন্নাতল ময়াল্লা নামক পবিত্র সমাধি-ক্ষেত্রে সমাধিস্থ হয়েন।

৬। তপস্বী বশর হাফী।

এই প্রস্তাবের শিরোভাগে যে মহাত্মার নামাঙ্কিত হইল, যিনি করুণাময়ের কৃপাসিন্ধুর বিন্দুবারি সিঞ্চনে খোদা প্রেমে নিয়ত নিমজ্জিত থাকিয়া উত্তরকালে পুণ্যাত্মা নামে অভিহিত হইয়া গিয়াছেন, যিনি অগাধ ধী-শক্তিমান্ ও পাণ্ডিত্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন, যিনি কঠোর ধ্যান-ধারণায়, অবিচল ও গভীর তত্ত্বজ্ঞানে প্রভাময় প্রভাকর সদৃশ তেজস্বী ছিলেন, “সুফী” এই গৌরবাত্মক উজ্জ্বলাভরণে যাঁহার পবিত্র চরিত্র সুশোভিত হইয়া রহিয়াছে, তাঁহার জীবনের প্রথমাবস্থার কথা স্মরণ করিলে অন্তরে এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময়ের উদয় হইয়া থাকে। বশর মরও নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি জন্মভূমি

পরিত্যাগ করিয়া বোগ্‌দাদবাসী হইয়াছিলেন। বাল্যজীবন হইতে যৌবনের অনেক সময় পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মে কর্ম্মে কিছুমাত্র মতিগতি ছিল না,—নিয়ত কুসংসর্গে পরিবৃত থাকিয়া জঘন্য পৈশাচিক আমোদোৎসবে লিপ্ত থাকিতেন।

বশর হাফী অতিশয় মদ্যপ ছিলেন; মদ্য-মাংস ব্যতীত এক মুহূর্ত্তও চলিতেন না। সুরাপানে উন্মত্ত হইয়া বিশৃঙ্খলভাবে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিতেন; জনসাধারণে তাঁহাকে এক জন অসচ্চরিত্র ও অপবিত্র পুরুষ ভিন্ন অপর কিছুই বলিয়া জানিত না। কিন্তু সেই সম্ভব-অসম্ভবের একমাত্র অধিনায়ক বিশ্বপাতা রাজাধিরাজ যাহার প্রতি সদয় হন, ইহলৌকিক অপযশঃ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে তাহার আর কতটুকু সময় লাগে? একদা কদাচারী বশর হাফী উন্মত্তাবস্থায় যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, পথপ্রান্তে এক খণ্ড ছিন্ন কাগজ পতিত রহিয়াছে। মনে কি ভাবিয়া তিনি সেই কাগজখণ্ড মৃত্তিকা হইতে তুলিয়া লইয়া ধূলিমুক্ত করিলেন। পরে অর্দ্ধমুদিত নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া দেখেন, তাহাতে পবিত্র "বিস্‌মেল্লা করিমা" লিখিত রহিয়াছে। তখন তিনি ত্রস্ততার সহিত ঐকান্তিক ভক্তি সহকারে যথোচিত সম্মান ও পবিত্রতা সংরক্ষণ করিয়া সেই পত্র-লিখিত সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বেশ্বরের সুপবিত্র নাম পাঠ করিলেন এবং অতঃপর মূল্যবান্ আতর ক্রয় করিয়া উক্ত কাগজখণ্ড তাহাতে আর্দ্র করত স্বীয় গৃহে সমধিক যত্নে ও সাবধানে রাখিয়া দিলেন।

এদিকে অপার কারুণিক বিশ্বকর্ত্তাও নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সদ্বিচারক ও পরমদাতা,—সেই দিবস নিশীথ সময়ে বোগ্দাদবাসী জনৈক ধার্ম্মিক ব্যক্তির প্রতি স্বপ্নাদেশ করিলেন। স্বপ্নে তাঁহাকে এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল যে, তুমি কল্য প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বশর হাফীর নিকটে গমনপূর্ব্বক তাহাকে কহিবে "তুমি যেরূপ যত্ন সহকারে বিশ্বপতির পবিত্র নামের সম্মান রক্ষা করিলে, অপবিত্র ধূলিশয্যা হইতে উত্তোলন করত পবিত্র অবস্থায় অবস্থাপিত করিলে, সুগন্ধি আতর প্রদানে সুরভিত করিলে, তিনিও তদ্ধেতু তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তৎপরিবর্ত্তে জগতে তোমার যশঃ ও সম্মান বৃদ্ধি এবং তোমার অন্তর হইতে অপবিত্রতার বদ্ধমূল মূল উৎপাটিত করিয়া চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া দিবেন। তুমি ইহলোকে ধন্য ও পরলোকে পুণ্যের প্রভাবে পরম-পদের অধিকারী হইয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিবে।" স্বপ্নদর্শক এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইলেন। ভাবনার ভয়ানক তরঙ্গ-তাড়নায় তাঁহার অন্তর আন্দোলিত হইতে লাগিল। অবশেষে বশর হাফীর দুশ্চরিত্রতার কথা স্মৃতিপথে উদিত হওয়ায় এ স্বপ্ন অমূলক—ভিত্তিহীন; পাপপঙ্কিল ব্যক্তি কি ঈদৃশ দৈবানুগ্রহের যোগ্য হইতে পারে? আমার ভয়ানক ভ্রম হইয়াছে ভাবিয়া তিনি নিশ্চিন্ত রহিলেন। কিন্তু পর দিবস পুনর্ব্বার সেই স্বপ্নদর্শন। তিনি তাহাও উপেক্ষা করিলেন। এবার ভাবিলেন, ইহা প্রথম

স্বপ্ন-দর্শনের আন্দোলনজনিত ফল ব্যতীত আর কিছুই নহে। এইরূপে দুই দিন কাটিয়া গেল। তৃতীয় দিবসে নিরুদ্বেগে দৈনিক কার্য্য নিষ্পন্নের পর তিনি বিশ্রামার্থ নিশিতে নিয়মিত সময়ে শয়ন করিলেন। যখন গভীর নিদ্রায় অভিভূত, সংসারের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে, সেই সময়ে আবার সেইরূপ স্বপ্নাদিষ্ট হইলেন। এবার তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি জাগরিত হইয়া "ইহা নিঃসন্দেহ দৈবাদেশ, উপেক্ষা করিয়া ভাল করি নাই; অপরাধ করিয়াছি। হায়, আমার এ অপরাধ অমার্জ্জনীয়" ইত্যাকার বহুবিধ অনুশোচনা করিতে লাগিলেন। দুর্ভাবনায় আর তাঁহার নিদ্রা হইল না।

পর দিবস প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া বশর হাফীর অনুসন্ধানে বাহির হইলেন। কিন্তু কি বিড়ম্বনা! বালক-যুবা-বৃদ্ধ, যাহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, সেই-ই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলে, "বশর হাফীকে আপনার প্রয়োজন? সে সুরাপানে রঙ্গালয়ে আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িয়া আছে।" এতৎ শ্রবণে তিনি সঙ্কুচিত হইয়া দ্বিধা বা বাক্যমাত্র ব্যয় না করিয়া বশর হাফীর ভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। এবং জনৈক প্রতিবাসীর দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়া দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন। বশর হাফী মত্ততাবস্থায় প্রতিবাসীকে কহিলেন, "আগন্তুক কি জন্য আসিয়াছেন, অগ্রে তাহা জানিয়া আইস।" এ ব্যক্তি স্বপ্নদর্শক মহাত্মার নিকট প্রতিগমনপূর্ব্বক তাঁহার আগমনের কারণ অবগত হইয়া গিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "তিনি তোমার জন্য

ঐশিক সুসমাচার আনয়ন করিয়াছেন।" এই কথা শ্রবণমাত্র তাঁহার যুগলনয়ন হইতে অনর্গল অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল, হৃদয় কি যেন এক গুরু ভারাক্রান্ত হইয়া দমিয়া গেল। ভাবিলেন, হয়ত ঐশিক শাস্তির সমাচার আসিয়াছে। তখন তিনি কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে স্বকীয় সহযোগীদিগকে বিদায় প্রদান করিলেন; কহিলেন "ভ্রাতৃগণ! এই বিদায় চির-বিদায়, আর তোমরা আমাকে এই অসৎ কার্য্যে লিপ্ত দেখিতে পাইবে না।" ইহা বলিয়া দ্রুত পাদবিক্ষেপে সেই নরক সদৃশ অপবিত্র স্থান হইতে বহির্গত হইয়া তিনি একান্ত অন্তঃকরণে তওব্যার সহিত প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক সুরাপান পরিবর্জ্জন করিলেন। ফলতঃ "ঐশিক শুভ সংবাদ" এই কথা শ্রবণমাত্র দৈবানুগ্রহে তাঁহার মোহান্ধকার দূরীভূত হইয়া হৃদয় উজ্জ্বল আলোকে দীপ্তিমান হইয়াছিল। জ্ঞাননেত্র বিকশিত হওয়ায় সেই মুহূর্ত্তেই সুরার উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মিয়াছিল; স্বীয় কার্য্য পাপমূলক, ইহা সুন্দররূপ বোধগম্য হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি গভীর অনুশোচনার সহিত বিগত অপরাধের জন্য খোদার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং এমনি হইলেন যে, আহার, নিদ্রা, বিহার, বিশ্রামাদির উপর লক্ষ্য না রাখিয়া অবশিষ্ট জীবনের একমাত্র লক্ষ্য সেই বিশ্বপতির ধ্যানে নিমগ্ন রহিলেন। একে দৈবানুগ্রহ, তাহাতে আবার নিজে সুশিক্ষিত ও বুদ্ধিমান্ ছিলেন; সুতরাং ঐশিকতত্ত্বে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে তাঁহার আর অধিক বিলম্ব বা কষ্ট পাইতে হইল না।

এই সময় হইতে বশর হাফী ধর্ম্মানুমোদিত সৎক্রিয়া ভিন্ন অসৎ কার্য্যের ছায়া স্পর্শও করিতেন না। তিনি সাধারণের ভক্তি, ভালবাসা ও সম্মান আকর্ষণের উপযুক্ত পাত্র হইলেন। লোকে তাঁহাকে দর্শন বা তাঁহার নাম শ্রবণ মাত্র সাদর সম্ভাষণের সহিত সম্মান প্রদর্শন ও যশকীর্ত্তন করিতেন। এইরূপে এক জন অপকর্ম্মশীল হীন ব্যক্তি ধর্ম্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়া ধর্ম্মশীল মহাত্মা নামে পরিগণিত হইলেন। কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! তাই বলিয়াছি, দৈবানুকূল হইলে, অসম্ভব সম্ভব হইতে আর অধিক সময় বা আয়াসের আবশ্যক করে না। কত কাল হইল, মহাত্মা বশর হাফী মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, তাঁহার দৈহিক পরমাণুনিচয় কোথায় বিলীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার পবিত্র নাম স্বদেশ বিদেশে সর্ব্বত্রই সাহিত্য, ইতিহাস ও কবি-গাথায় গীত ও ভক্তির সহিত উচ্চারিত হইতেছে এবং যত কাল মানবকুলের বিদ্যমানতা বিলুপ্ত না হইবে, তত কাল উচ্চারিত হইবে, তাহাতে আর সংশয় নাই।

বশর হাফী এইরূপে উন্নত জীবন লাভ করিয়া আল্লার নামে আত্মোৎসর্গ করিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে খোদা-চিন্তায় এরূপ নিমগ্ন থাকিতেন যে, অপর কোনও বিষয়ের দিকে লক্ষ্য করা দূরে থাক, স্বীয় বেশবিন্যাসের প্রতিও তাঁহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না। সেই একাগ্রতা নিবন্ধনই তিনি অতঃপর পাদুকা পরিধান করেন নাই এবং তজ্জন্যই সাধারণে তাঁহাকে হাফী অর্থাৎ পাদুকাহীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। অগ্রে তিনি কেবল

"বশর" নামেই পরিচিত ছিলেন। অনেকে তাঁহাকে পাদুকা গ্রহণ না করার কারণ জিজ্ঞাসিলে তিনি উত্তর করিলেন "যে দিন তওবা করিয়া আল্লার উপর আত্মসমর্পণ করি, তখন আমার পদদ্বয় পাদুকাশূন্য ছিল, সেই জন্য এখন পাদুকা পরিতে লজ্জা উপস্থিত হয়। আরও পরমপিতা বলিয়াছেন, "এই বিস্তীর্ণ ধরাতল তোমাদের আস্তরণস্বরূপ সৃষ্টি করিয়াছি। অতএব সেই "শাহী" শয্যায় পাদুকা পরিধানপূর্ব্বক গমনাগমন করা যুক্তিযুক্ত ও সভ্যতা-সম্মত নহে। অনেক সাধক পুরুষ মৃত্তিকায় প্রস্রাব এবং নিষ্ঠাবন নিক্ষেপ করিতেন না। কারণ তাঁহারা ভূতলেও ঐশিক জ্যোতিঃ নয়নগোচর করিতেন।" বশর হাফী তপস্যায় তন্ময় হইয়া এরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহারও এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক যাঁহারা সুদুস্তর সাধন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া কূল প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের এই অবস্থাই ঘটিয়া থাকে। তাঁহারা ঐশিক জ্যোতিঃ ব্যতীত বিশাল ভূমণ্ডলে অপর কিছুই দেখিতে পান না। সেই জন্যই শেষ তত্ত্ববাহক পূজ্যপাদ জগদ্গুরু হজরত মহম্মদ মস্তফা সালেবা নামক জনৈক ব্যক্তিকে কবরস্থ করণার্থ অতি সাবধানে পদাঙ্গুলিতে ভর দিয়া যাইতে যাইতে বলিয়াছিলেন, "আমার ভয় হইতেছে, পাছে ফেরেস্তার (স্বর্গীয় দূত) উপর আমার পদ পতিত হয়। কেননা ফেরেস্তাও ঐশিক জ্যোতিঃস্বরূপ।"

এইরূপ বিবৃত আছে যে, এক দিবস নিশাকালে সাধুবর স্বীয় গৃহে প্রবেশ করিতেছিলেন। কিন্তু তিনি কি ভাবিয়া গৃহমধ্যে

প্রবিষ্ট না হইয়া এক পদ দ্বারাভ্যন্তরে এবং অপর পদ বহির্দ্দেশে স্থাপন করিলেন এবং সেই অবস্থায় ঐশিক প্রেমে উদ্ভ্রান্ত হইয়া প্রভাত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া রহিলেন। কি অলৌকিক সাধন-সহিষ্ণুতা! প্রকৃত সাধক ব্যতীত এ কার্য্য কি অপর কর্ত্তৃক সংসাধিত হইতে পারে? অন্য এক দিবস তাঁহার এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। বশর হাফীর এক সহোদরা ছিলেন। একদা তিনি সেই ভগিনীর গৃহে উপনীত হইয়া ছাদে উঠিতে যাইতে-ছিলেন, কিন্তু সোপানশ্রেণীর কতিপয় ধাপ পার হইয়া আর পদোত্তোলন করিলেন না; উদাস-নয়নে এক দিকে চাহিয়া সমস্ত রাত্রি দাঁড়াইয়া রহিলেন। অতঃপর প্রাভাতিক উপাসনা সাঙ্গ করিয়া ভগিনীর নিকটে সমাগত হইলে তিনি সেই ঘটনার কারণ কি, জানিতে চাহিলেন। তাহাতে বশর হাফী কহিলেন "বোগদাদ নগরে আমার নামে কয়েক জন লোক বাস করে। তাহারা সকলেই বিধর্ম্মী, আর আমি ইস্‌লামবাদী মুসলমান। তাহারা কি জন্য ইস্‌লামের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া নরকের দিকে অগ্রসর হইতেছে, আর আমিই বা কি এমন পুণ্য কার্য্য করিয়াছি যে, তৎপ্রভাবে ইস্‌লাম রূপ অমূল্য রত্নের অধিকারী হইলাম? ভগিনি! এই ভাব উদিত হওয়ায় আমি বিস্ময়বিজড়িত চিত্তে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলাম।"

মহাত্মা বেলাল খাওয়াস বলিয়া গিয়াছেন "আমি এক দিন বনি এস্‌রাইলের জঙ্গলাভিমুখে গমন করিতেছিলাম। আমার সহগামী অপর এক ব্যক্তি ছিল। আমি অবধারণ

করিয়াছিলাম যে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই পুণ্যাত্মা খাজা খেজর হইবেন। আমার এই অনুমানের যাথার্থ্য প্রতিপন্ন মানসে কহিলাম, "মহাভাগ! আপনি কে? কোথা হইতে আসিতেছেন এবং কোথায় যাইবেন?" এই প্রশ্নে তিনি কহিলেন, "আমি তোমার ভ্রাতা খাজা খেজর।" ধর্ম্মবীর খেজরের নাম শ্রবণে আমি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক কহিলাম, "ধর্ম্ম বিষয়ে হজরত ইমাম শাফীর সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?" উত্তর করিলেন, "তিনি এক জন উন্নত জ্ঞানসম্পন্ন উপদেষ্টা বটেন।" কহিলাম, "হজরত আহম্মদ হাম্বল?" খেজর বলিলেন, "হাম্বল দৃঢ় ধর্ম্ম-বিশ্বাসী পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদিগের অন্যতম ব্যক্তি।" অবশেষে কহিলাম, "বশর হাফী কেমন লোক?" বলিলেন, "বশর হাফীর পরে তত্তুল্য অপর কোন ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবেন না।" এইরূপ আরও অনেক তত্ত্বদর্শী লোক বশর হাফীর ন্যায়নিষ্ঠা ও তপশ্চর্য্যার বিষয়ে অনেক প্রশংসার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

কোন ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি বর্ণনা করিয়াছেন যে, আমি এক দিন বশর হাফীর নিকট উপবেশন করিয়াছিলাম। সে দিবস শীতের অতিশয় প্রাদুর্ভাব ছিল। তিনি সেই প্রবল শীতে গাত্রে বস্ত্রাদি [illegible] য়া থর থর করিয়া কাঁপিতেছিলেন। আমি তাঁহার এই দুর্দ্দশা দেখিয়া কহিলাম, এ আপনার কিরূপ ভাব! বুঝিতে পারিলাম না!!" তিনি প্রসন্নমুখে উত্তর করিলেন, "আমি এতদ্দ্বারা দরবেশদিগকে স্মরণ করিতেছি।

অর্থাদির দ্বারা সে কার্য্য সাধন করিবার শক্তি আমার নাই; তাই তাঁহাদের ন্যায় নগ্ন দেহ হইলাম।” আমি পুনঃ বলিলাম, “আপনি এই পরম পদ কি প্রকারে লাভ করিলেন?” তিনি বলিলেন, “ইহার একমাত্র কারণ, আমি স্বীয় অবস্থা সেই মঙ্গলময় জগদীশ্বর ভিন্ন অপর কাহাকেও জানিতে দেই নাই। বাস্তবিক, খোদা ব্যতীত অপরের নিকট আত্মকথা প্রকাশ করিলে কি ফল হইতে পারে?”

কতিপয় তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন উন্নত পুরুষ এক সময়ে বশর হাফীর সমক্ষে ধর্ম্ম বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি তাঁহাকে বলিলেন, “যদি কেহ প্রীতিভরে আপনাকে কোন দ্রব্য প্রদান করিতে আইসে, তবে আপনি তাহা গ্রহণ করেন না কেন? জানি আপনি সংসার-নির্লিপ্ত সাধু ব্যক্তি; কিন্তু তাহা হইলেও লোকের সন্তোষ বিধানার্থ ভক্তি-দত্ত উপহার গ্রহণ করত দীন দুঃখীদিগকে বিতরণ করুন এবং খোদার উপরে আত্মসমর্পণ করিয়া অদৃশ্য হইতে শক্তি আকর্ষণ করুন।” বশর হাফীর শিষ্য-মণ্ডলীর এ কথা ভাল লাগিল না। কিন্তু বিকার-রহিতচিত্ত বশর হাফী অম্লানবদনে তাহার উত্তর করিলেন। কহিলেন, “জগতে ফকির (দরিদ্র লোক) ত্রিবিধ। প্রথম প্রকারের ফকির কখন কাহারও দ্বারস্থ হন না, কাহার নিকট কিছুই প্রার্থনা করেন না; এবং কেহ কোন দ্রব্য প্রদান করিলেও গ্রহণ করা দূরে থাক, বরং বেগে পলায়ন করেন। এই শ্রেণীর ফকিরসমূহ আধ্যাত্মিক

যোগ-বল-সম্পন্ন। ইঁহারা খোদার নিকট যে প্রার্থনা করেন, দয়াময় অবিলম্বে তাহা পূর্ণ করিয়া দেন। দ্বিতীয় প্রকার, যাঁহারা কাহার নিকট ভিক্ষার্থী নহেন, কিন্তু কিছু কিছু দিলে গ্রহণ করেন। ইঁহারা মধ্যম শ্রেণীভুক্ত ফকির। ইঁহারাও খোদার উপর দৃঢ় নির্ভর করিয়া শান্তচিত্তে অবস্থান করেন, ইঁহারা স্বর্গীয় সুখসম্ভার প্রাপ্ত হইবেন। তৃতীয়তঃ, ধৈর্য্যশীল ফকিরসম্প্রদায়; ইঁহারা স্বীয় অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া খোদার নামে স্থির বিশ্বাসে পড়িয়া থাকেন।” এই জ্ঞান-গর্ভ উত্তর শ্রবণে প্রাগুক্ত ব্যক্তি প্রফুল্লবদনে বশর হাফীকে কহিলেন, “আমি আপনার বাক্যে পরম প্রীতি প্রাপ্ত হইলাম। আমার ন্যায় খোদাও আপনার উপর সন্তুষ্ট হউন।”

শ্যাম (সুরিয়া) প্রদেশ হইতে এক দল লোক বোগদাদে আসিয়া উপনীত হন। তাঁহারা মহর্ষি বশর হাফীকে কহিলেন, “হজব্রত উদ্‌যাপনার্থ আমরা পবিত্র মক্কাধামে যাইতে অভিলাষ করিয়াছি; আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন।” তাহাতে তাপস-প্রবর বলিলেন, “তিন বিষয়ে অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলে আমি তোমাদের সহিত গমন করিতে পারি। প্রথম, অর্থ ও খাদ্য দ্রব্যাদি কিছুই সঙ্গে লইতে পারিবে না; দ্বিতীয়, কোনও ব্যক্তির নিকট প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চাহিতে পারিবে না এবং তৃতীয়, কেহ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কোন বস্তু দিলেও লইবে না। এই তিনটী বিষয় যদি পালন কর, তাহা হইলে আমার যাইতে আপত্তি নাই।” তাঁহারা কহিলেন, “আমরা প্রথমোক্ত বিষয়

দুইটী রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইলাম, কিন্তু তৃতীয়টী পালন করিতে পারিব না।” ইহা শুনিয়া তাপস বলিলেন, “এখন আমি স্পষ্ট বুঝিলাম, তোমরা তবে হাজীদের পাথেয় অর্থের ভরসায় চলিতেছ। কাহারও নিকট কোন বস্তু লইব না, ইহা যদি হৃদয়ে জাগরূক থাকে, তবে তাহাকেই খোদার প্রতি নির্ভর করা বলে এবং আমিও তাহাই বলিয়াছি।”

বশর হাফীকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন “আমার সদুপায়-লব্ধ দুই সহস্র মুদ্রা আছে। বাসনা, তদ্দারা হজক্রিয়া নির্ব্বাহ করি, কিন্তু ইহাতে আপনার পরামর্শ কি? জানিতে চাই।” তিনি কহিলেন, “হাস্যোল্লাস উপভোগার্থ তোমার মক্কা-তীর্থে যাইতে ইচ্ছা। কিন্তু যদি পরম পিতার প্রীতিলাভাশায় তথায় যাইতে অভিলাষ কর, তাহা হইলে সেই অর্থ দরিদ্র-দিগকে বিতরণ করিয়া দেও। তদ্দ্বারা তাহারা অভাবের কঠোর কশাঘাত হইতে রক্ষা পাইয়া স্বচ্ছলতার সুখার্ণবে ভাসমান হইবে। একার্য্য তোমার শত শত হজ কার্য্য হইতেও উত্তম ও পুণ্যপ্রদ।” ইহা শ্রবণান্তর সেই ব্যক্তি বলিল, “হজব্রত পালন করিতেই আমার অপার আগ্রহ।” তখন বশর হাফী কহিলেন, “বুঝিলাম, তোমার এই অর্থ বৈধ উপায়ে উপার্জ্জিত নহে; নতুবা অকারণে অপব্যয় করিতে ইচ্ছা করিবে কেন?”

তাপসপ্রবর যখন অন্তিম দশায় সমুপস্থিত, অচিরে ইহ-লৌকিক ক্রিয়া সাঙ্গ করিবেন, সেই সময়ে এক ব্যক্তি তাঁহার সমীপে সমাগত হইয়া আপনার দুঃখদরিদ্রতার বিষয় জ্ঞাপন-

পূর্ব্বক এক খানি বস্ত্র প্রার্থনা করে। পরদুঃখকাতর মহাত্মা বশর হাফী তাহার কষ্টের কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত বিষাদিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ আপনার পরিধানস্থ অঙ্গাচ্ছাদনী খানি উন্মোচন করত তাহাকে প্রদান করিলেন। পরে আপনার নগ্ন দেহ আবৃত করণার্থ অপর এক ব্যক্তির নিকট এক খানি বস্ত্র গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কি অপূর্ব্ব ঘটনা! লীলাময়ের লীলামাহাত্ম্যে সাধুবর সেই বস্ত্রে অঙ্গাবৃত করিয়া অসার দেহ-বাস পরিত্যাগপূর্ব্বক শান্তিপূর্ণ চির সুখময়ধামে প্রস্থান করিলেন। প্রিয় পাঠক! একবার প্রণিধান করুন, এই পৃথিবীতে যাঁহারা বাস্তবিকই ধর্ম্মপরায়ণ সাধু পুরুষ, পরদুঃখ দর্শনে বাস্তবিকই যাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হয়, মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইয়াও তাঁহাদের হস্ত দান-ক্রিয়ায় সঙ্কুচিত নহে!'

বশর হাফীর সাধুতা জগৎপ্রসিদ্ধ। তিনি জীবনে অনেক কৃচ্ছ্রসাধ্য সাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহার তত্ত্বোপদেশপূর্ণ মধুর প্রবচনসমূহ পাঠ করিলে হৃদয়ে অপূর্ব্ব শান্তি-রসের আবির্ভাব হয় এবং অন্তর ধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে; কোটি কোটি মানব সময়-সাগরে জলবুদ্‌বুদ্‌বৎ উত্থিত হইয়া অদৃশ্য হইয়াছে, কিন্তু সেই মহাপুরুষ নর-লোচনের অন্তরালে থাকিয়া চিরদিন সমভাবে জগতে ভক্তি, ভালবাসা, সম্মান ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছেন; জগৎ অবনত মস্তকে তাঁহার পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া ধন্য হইতেছে।

৭। তপস্বী আবু হেফ্‌স।

তপস্বী আবু হেফ্‌স খোরাসান নগরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার সময়ে তৎসদৃশ ধর্ম্মভীরু তেজস্বী সাধু পুরুষ অপর কেহই বিদ্যমান ছিলেন না। তাঁহার ধর্ম্মশাস্ত্রে যেরূপ প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি ছিল, ধর্ম্মানুষ্ঠানেও তদনুরূপ প্রবল অনুরক্তি জন্মিয়াছিল। তাঁহাকে ঐশী তত্ত্বের ভাণ্ডার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সত্যনিষ্ঠা, সরলতা, সাধুতা প্রভৃতি মোহনীয় গুণে আবু হেফ্‌স সকল সমাজেই সমাদৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার দর্শনলাভার্থ প্রসিদ্ধ সাধক শাহ শুজা কের্ম্মাণ প্রদেশ হইতে তৎসমীপে সমাগত হন। মহর্ষি অনেক সাধুসহবাস করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি আজন্ম বিশুদ্ধ চরিত্রের লোক ছিলেন না। জীবনের প্রারম্ভকালে তিনি সাধু-সমাজবিগর্হিত অপকর্ম্মেই লিপ্ত থাকিতেন, উচ্ছৃঙ্খল-স্বভাব মন্দমতি দুষ্ট লোকেরা তাঁহার সহচর ছিল। কিরূপ অপূর্ব্ব ঘটনায় তাঁহার ধর্ম্মজীবন লাভ ঘটে, কিরূপে তিনি সংসারের প্রলোভনময় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সাধু-সমাজের স্পৃহনীয় পুণ্য-পথের পথিক হইয়াছিলেন, বিভীষিকাপূর্ণ অন্ধকারময় পাপপথ পরিহার করিয়া চিরানন্দময় দীপ্তিমান্ ধর্ম্মপথে উপনীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তাহাই বিবৃত করা যাইতেছে।

একদা আবু হেফ্‌স একটী পরম রূপলাবণ্যবতী ষোড়শী যুবতীর প্রেমাসক্ত হইয়াছিলেন। অপরিবর্জ্জনীয় কামানলে তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল। তিনি সেই সুর-সুন্দরীর সহবাস-সুখলাভের জন্য দিবানিশি উন্মত্তের ন্যায় ফিরিতেন। আহার, নিদ্রা, বিশ্রামে স্পৃহা ছিল না; কি দিবসে, কি নিশীথে, কি উপায়ে সেই রমণীরত্ন লাভ করিবেন, কিরূপে মনোরথ সিদ্ধ হইবে, নিয়ত সেই চিন্তাতেই মগ্ন থাকিতেন। কিন্তু অশেষবিধ প্রলোভন-জাল ও কৌশল বিস্তার করিয়াও তিনি সফলকাম হইতে অসমর্থ হইলেন,—পুণ্যবতী সতী সেই জালে জড়িত হইলেন না। তখন নিরুপায় আবু হেফ্‌স হতাশে বিকলচিত্ত হইয়া একেবারে উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চক্ষে অখিল সংসার কালানলপূর্ণ বোধ হইতে লাগিল, মর্ম্মগ্রন্থি যেন বিষদিগ্ধ বাণবিদ্ধ হইতে লাগিল। সুখশান্তি, আশা-ভরসা সমস্তই ইহজন্মের মত জলাঞ্জলি দিয়া তিনি এক অভিনব জীবের মধ্যে পরিগণিত হইতে চলিলেন।

এক ব্যক্তি তাঁহার ঈদৃশী দুর্দ্দশা দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে কহিল, "হে যুবক! নেশাপুরে যাও, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। তথায় এক জন ইন্দ্রজাল-বিদ্যাবিশারদ ইহুদী বাস করে। তাহার নিকটে মনোভিলাষ ব্যক্ত করিলে সে মন্ত্র-প্রয়োগে তোমার কার্য্যোদ্ধার করিয়া দিবে।" আবু হেফ্‌স তৎশ্রবণে প্রফুল্লমনে নেশাপুরে গমন করিলেন। তথায় সেই ইহুদী ইন্দ্রজালিকের ভবনে উপনীত হইয়া করুণকণ্ঠে আপনার দুরবস্থার বিষয় বিবৃত

করিলেন এবং তাহার পদানত হইয়া স্বীয় মনস্কামনা সিদ্ধির উপায়-বিধান করিয়া দিবার জন্য অশেষ প্রকারে অনুরোধ করিলেন। ঐন্দ্রজালিক অভয়দানে কহিল, "ইহা ত অতি সহজসাধ্য সামান্য কার্য্য, ইহার জন্য অধিক কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। আমার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিলেই তোমার বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। তুমি যদি ধর্ম্মকার্য্য ও ঈশ্বরারাধনা করিয়া থাক, তবে একাধিক্রমে চল্লিশ দিবস পর্য্যন্ত তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। ঐ সময়ের মধ্যে কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান করা দূরে থাক, পুণ্য-কার্য্যের কল্পনাও অন্তরে স্থান দিতে পারিবে না। এইরূপে চল্লিশ দিবস সদিচ্ছা হইতে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিলে আমি মন্ত্র প্রয়োগ করিব; তুমি সেই মন্ত্রবলে তোমার সেই হৃদয়হারিণী কামিনার সহিত অচিরে সম্মিলিত হইবে; তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।"

আবু হেফ্‌স ঐন্দ্রজালিকের বাক্য শিরোধার্য্য করিয়া তৎপালনে স্বীকৃত হইলেন এবং চল্লিশ দিন সেই কঠোর নিয়মে অবস্থানপূর্ব্বক তাহার নিকটে পুনরাগমন করিলেন। ঐন্দ্রজালবেত্তা আবু হেফ্‌সকে সমাগত দেখিয়া যথানিয়মে তাঁহার উপর মন্ত্র-প্রয়োগ করিল; কিন্তু উহা বিফল হইয়া গেল, কিছুতেই মন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হইল না। এতদ্দর্শনে ঐন্দ্রজালিক দুঃখিত হইয়া কহিল, "যুবক! নিশ্চয়ই এই চল্লিশ দিবস মধ্যে তোমা কর্ত্তৃক কোন সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়াছে। নতুবা আমার মন্ত্র ত কোনক্রমেই বিফল হইবার নহে! তুমি

এই চল্লিশ দিবসের দৈনন্দিন কার্য্য বিশেষরূপে স্মরণ করিয়া দেখ।” আবু হেফ্‌স নীরবে কিছুক্ষণ চিন্তার পর কহিলেন, “আমি ইহার মধ্যে এমন কোন পুণ্যকার্য্য করি নাই; তবে একদা ভ্রমণকালে পথিমধ্যে এক খণ্ড প্রস্তর পতিত ছিল, দেখিয়া পাছে উহা কাহার পায়ে লাগিয়া বেদনা প্রদান করে, ইহা ভাবিয়া স্থানান্তরিত করিয়াছিলাম মাত্র। ইহা ব্যতীত আমি অন্য কোন সদনুষ্ঠান করি নাই বা কাহার কৃত কোন সৎকর্ম্মের সমর্থকও হই নাই।” তখন ঐন্দ্রজালিক হাস্যমুখে বলিল “যুবক! আর তুমি সৃষ্টিকর্ত্তার বিপক্ষতাচরণ করিয়া তাঁহার অসোন্তষ জন্মাইও না। এই চল্লিশ দিবস তুমি আমার আদেশে তাঁহার মঙ্গলময় অনুজ্ঞা অমান্য ও অবহেলা করিয়া আসিয়াছ। কিন্তু দেখ; তিনি কিরূপ দয়াময়। বাস্তবিকই তিনি অপার দয়াময়, ক্ষমাশীল ও স্নেহপ্রবল-হৃদয় পরমপিতা। স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া কোন কার্য্য না করিলেও, কার্য্য যেরূপেই সম্পন্ন হউক, তিনি কার্য্যকর্ত্তাকে তাহার ফল প্রদান করিতে কুণ্ঠিত নহেন। তুমিই এ বিষয়ের এক জাজ্বল্যমান সুন্দর প্রমাণ। তুমি যে ক্ষুদ্র পুণ্যকার্য্যটী করিয়াছ, তাহারই প্রভাবে আজ আমার মন্ত্রবল ব্যর্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া গেল এবং তুমিও এক দুরপনেয় পাপকার্য্য হইতে পরিত্রাণ লাভ করিলে। দেখ দেখি, তাঁহার কত দয়া!! ক্ষণিক সুখভোগের জন্য সেই সর্ব্ব-সুখ-নিদান জগদীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ ও অবিনশ্বর সুখের পথে কণ্টক নিক্ষেপ করা কোনক্রমেই উচিত নহে।”

ঐন্দ্রজালিকের মুখে এই কথা শুনিয়া আবু হেফ্‌সের চৈতন্যোদয় হইল। তাঁহার হৃদয়ে মুহূর্ত্ত মধ্যে অনুতাপের নিদারুণ হুতাশন সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। তিনি থর থর কাঁদিতে লাগিলেন; নেত্র জল-প্লাবিত, দেহযষ্টি শ্লথ। ভগ্নকণ্ঠে কাতর ক্রন্দনে "হায় আমি কি করিলাম" বলিয়া কত অনুশোচনা করিতে লাগিলেন এবং সেই ঐন্দ্রজালিকের সম্মুখেই পাপকার্য্যে চিরবিরত থাকিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। এই হইতেই তাঁহার জীবনগতি ধর্ম্মের দিকে প্রবাহিত হইল। তিনি যে রত্ন লাভের জন্য এত দিন লালায়িত ছিলেন, যাহার কারণে এই দূরবর্ত্তী স্থানে আসিয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজ তাহা তাঁহার চক্ষে নিতান্ত ঘৃণিত, অসার ও অপদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আজ তিনি তৎপরিবর্ত্তে চিরজ্যোতির্ম্ময় অনন্তকাল স্থায়ী মহামূল্য ধর্ম্মভাণ্ডারের উদ্দেশ পাইয়া তল্লাভার্থ মনোনিবেশ করিলেন। দুঃখীর দুঃখমোচন, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, পীড়িতের রোগ-শুশ্রূষা ইত্যাদি অশেষবিধ পরোপকারে জীবনোৎসর্গ করিলেন। তিনি ধর্ম্মবিধি পরিপালন ও নির্জ্জনে ধ্যানধারণা বিশুদ্ধভাবে সম্পন্ন করিয়া এরূপ অলৌকিক উন্নত জীবনলাভ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সমকালে তিনি লোক-সমাজে বিশিষ্টরূপে সম্মানিত ও যশস্বী হইয়া গিয়াছেন এবং পরিণামে তপস্বিশ্রেণীর মধ্যে পরিগণিত হইয়া জগতের অকৃত্রিম ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রীতি ও সম্মানের পাত্র হইয়া রহিয়াছেন এবং

অনন্ত ভাবী কাল পর্য্যন্ত থাকিয়া সাধারণের বিস্ময় ও আনন্দ-বৰ্দ্ধন করিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।

আবু হেফ্‌স কর্ম্মকারের ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি জীবনের এই পরিবর্ত্তিত অবস্থাতেও সেই কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন না। সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া ইহাতে তাঁহার একটী করিয়া দিনার লাভ হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি সেই অর্থ স্বয়ং গ্রহণ করিতেন না; প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে দীন দরবেশদিগকে দান করিয়া দিতেন। তাঁহার দান-ক্রিয়া অতি সংগোপনে সংসাধিত হইত। তিনি উপায়হীনা দীনা স্ত্রীলোকদিগের গৃহ মধ্যে তাহাদের কষ্টের লাঘব মানসে অতি গুপ্তভাবে অর্থ নিক্ষেপ করিতেন। কে তাহা নিক্ষেপ করে? সহস্র যত্নেও সে বিষয় কেহ অবগত হইতে পারিত না। তিনি বার মাস রোজা রক্ষা করিতেন। সন্ধ্যার সময় ভিক্ষা করিয়া যাহা কিছু প্রাপ্ত হইতেন, তদ্দারা তাঁহার ক্ষুন্নিবৃত্তি হইত। যখন তিনি, লোকে জলাশয়ে খাদ্যাদি ধৌত করিবার সময় পাত্র হইতে যে কিছু সামান্য অংশ ঝরিয়া পড়িত, তাহাই সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ক্ষুধার শান্তি করিতেন। এইরূপে বহু কষ্টে দীর্ঘ কাল অতিবাহিত করার পর একদা জনৈক অন্ধলোক প্রকাশ্য পথ দিয়া একটী আয়েত (শ্লোক) পাঠ করিতে করিতে গমন করিতেছিল। একে পাঠকের কণ্ঠ-স্বর অতি মধুর, তাহাতে কবিতাটী আবার অতীব সদ্ভাবপূর্ণ; সুতরাং মহর্ষি তন্ময় হইয়া কর্ণ পাতিয়া শ্রবণ করিতে লাগিলেন

এবং তাহাতে এমনি বিভোর ও বিমুগ্ধ হইয়া পড়িলেন যে, সেই প্রচণ্ড অগ্নিকুণ্ড (হাপর) হইতে লোহিতবর্ণ প্রতপ্ত লৌহ হস্তে ধরিয়া উত্তোলন করত নেহাই উপরে স্থাপন করিলেন। অপর কারিকরগণ এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দর্শনে তাড়াতাড়ি তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলেন। কিন্তু তাহাতেও তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল না; পূর্ব্ববৎ অন্যমনস্কভাবে কহিলেন "তোমরা লৌহ পিটাও।" "পিটাব কোথায়? আপনার হস্ত তুলিয়া লউন।" অনন্তর সাধুপ্রবরের জ্ঞানের সঞ্চার হইল, দেখিলেন হস্তে উত্তপ্ত লৌহ ধরিয়াছেন। তখন ত্রস্ততার সহিত আর কাল বিলম্ব না করিয়া উহা ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ দোকানের যাবতীয় দ্রব্যজাত বিতরণ করিয়া দিয়া কহিলেন, "অনেক দিন হইতে আমার বাসনা যে, এই কার্য্য হইতে পৃথক হইব, কিন্তু এপর্য্যন্ত তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে এই পবিত্র শ্লোক আমাকে বিনা ক্লেশে ইহা হইতে অবসর প্রদান করিল। আমি কার্য্য হইতে হস্ত উঠাইয়া লই নাই, কিন্তু কার্য্য আমা হইতে হাত উঠাইয়া লইল। আমার কোন ফললাভ হইল না।" অনন্তর তিনি কঠোর যোগ-সাধনার্থ নিয়ত নির্জ্জন-নিবাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে তাঁহার জনৈক প্রতিবাসীর গৃহে শাস্ত্র-আলোচনার্থ এক সভা হয়। তিনি সেই সভায় যোগদান না করায় কোনও ব্যক্তি তাঁহাকে কহিল, "আপনি ধর্ম্মকথা শুনিতে যাইতেছেন না কেন?" তিনি উত্তর করিলেন, "আমি ত্রিশ বৎসর হইতে শাস্ত্রের একটী মাত্র কথা

পালন করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু সক্ষম হইলাম না। এমতস্থলে শাস্ত্রের অপর প্রসঙ্গ শুনিয়া কি করিব ?” সে ব্যক্তি কহিল “সেই কথাটী কি ? শুনিতে বাসনা করি।” তখন তিনি প্রফুল্লবদনে সেই শাস্ত্রীয় বচনটী আবৃত্তি করিয়া শুনাইয়া দিলেন।

একদা মহর্ষি স্বীয় শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিয়াছিলেন। সকলেই পরমানন্দে জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছেন, ইতিমধ্যে কোথা হইতে একটী হরিণ তাপস-রাজের নিকট দৌড়িয়া আসিল এবং তাঁহার ক্রোড়ের উপরে ধীরভাবে আপন মস্তক স্থাপন করিল। তাহাতে মহর্ষি আকুল হইয়া উর্দ্ধমুখে প্রার্থনা করিতে এবং উন্মত্তের ন্যায় আপনার দুই গণ্ডস্থলে করাঘাত করিতে লাগিলেন। হরিণ দীননয়নে মহর্ষির এই অবস্থা দেখিয়া আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া জঙ্গল অভ্যন্তরে চলিয়া গেল। শিষ্যগণ এই ঘটনায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কারণজিজ্ঞাসু হইলে আবুহেফ্স মৃদুস্বরে কহিলেন, “আমার অন্তরে এইরূপ ভাবের উদয় হইয়াছিল যে, যদি এখানে একটী ছাগ পাওয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার মাংস রন্ধন করত সকলের ক্ষুধা নিবারণ করিতাম, কাহাকেও আর ক্লেশ পাইতে হইত না। এই চিন্তার পর মুহূর্ত্তেই আল্লাহ্‌তালার আদেশে হরিণ আসিয়া উপস্থিত হয়।” তখন শিষ্যেরা কহিলেন, “বিশ্বস্রষ্টার সহিত যাঁহার ঈদৃশ প্রেম ও সৌহার্দ্দ, তিনি আবার করুণ স্বরে প্রার্থনা করেন কি জন্য ?” তিনি কহিলেন “তোমরা অবোধ,

বুঝিতেছ না, ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য সম্পাদিত হওয়া, আর দ্বার হইতে বহির্গত করিয়া দেওয়া, উভয়ই সমান। যদি পাপী-শাস্তা বিশ্ববিধাতা মিসররাজ ফেরাউনের মঙ্গল কামনা করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ইচ্ছানুসারে নীল নদের পরিবর্ত্তন সাধিত হইত না।”

এক দিন এক ব্যক্তিকে অবশাঙ্গে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া তপস্বিপ্রবর তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাতে সে ব্যক্তি তাঁহার পদপ্রান্তে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইয়া ভগ্নকণ্ঠে কহিল, “হায়, আর কি বলিব, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে। বিষয়-বিভবের মধ্যে আমার একটী মাত্র গর্দ্দভ ছিল; সেই গর্দ্দভটী হারাইয়া গিয়াছে। আমি তাহার অনুসন্ধানার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছি। আহার, নিদ্রা, বিশ্রাম আমা হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। আমার পরিণাম যে কিরূপ ভীষণত্বে পর্য্যবসিত হইবে, তাহা সেই সর্ব্বান্তর্য্যামী আল্লাহ্‌তালাই জানেন।” ইহা বলিয়া সেই দীন ব্যক্তি হাহাকার করিয়া আবার কাঁদিতে লাগিল। তপোধন তদ্দর্শনে অতীব দয়ার্দ্র হইলেন এবং দৃঢ়কায় শালবৃক্ষের ন্যায় সেই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া ঊর্দ্ধমুখে কহিলেন, “আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে পর্য্যন্ত এই ব্যক্তি আপনার অপহৃত গর্দ্দভ পুনঃ প্রাপ্ত না হয়, তদবধি এই স্থান হইতে আপন পদদ্বয় উত্তোলন করিব না, ভ্রমেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না।” মহর্ষি এইরূপ কঠোর অঙ্গীকার করিয়া বসিলেন। কিন্তু ভক্তের আব্‌দারে ভক্তরঞ্জন ভুবনেশ্বর কি বিচলিত না হইয়া স্থির

থাকিতে পারেন? সেই লীলাময়ের কৌশলে অপহৃত গর্দ্দভ মুহূর্ত্ত মধ্যে কোথা হইতে আসিয়া সমুপস্থিত হইল। তখন সেই রোরুদ্যমান দীন ব্যক্তি আপন গর্দ্দভ অবলোকন করিয়া হাস্য-মুখ হইয়া প্রস্থান করিল; মহর্ষিও প্রেমময়ের অনুগ্রহে কৃতজ্ঞ হইয়া তদীয় মহিমা-কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বীয় গন্তব্য পথের অনুসরণ করিলেন।

আবু ওসমান জেরি বর্ণনা করিয়াছেন "আমি এক দিন একাকী মহর্ষি আবু হেফ্‌সের নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তাঁহার সম্মুখভাগে কতকগুলি দ্রাক্ষাফল পতিত রহিয়াছে। আমি তন্মধ্য হইতে একটী ফল তুলিয়া লইয়া মুখে নিক্ষেপ করিলাম। আবু হেফ্‌স তদ্দর্শনে অতীব অসন্তুষ্ট হইলেন এবং সত্বরতার সহিত গাত্রোত্থান করিয়া সজোরে আমার গলদেশ চাপিয়া ধরিলেন; কহিলেন, "অপরাধি! তুমি আমার ফল খাইলে কি জন্য?" আমি কহিলাম, "আমার বিশ্বাস ও ধারণা যে, ফল খাইলে আপনি আমাকে কিছুই বলিবেন না এবং আরও অবগত আছি যে, আপনার যে-সমস্ত বস্তু আছে, তৎসমুদয় পরোপকারার্থ বিতরণ করিতে পারেন। এই সাহসেই বিনানুমতিতে আমি ফল ভক্ষণ করিয়াছি।" তপস্বী এই উত্তর শ্রবণ করিয়া গম্ভীরভাবে কহিলেন, "রে অজ্ঞান! আমি স্বয়ং আমার মনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না, তুমি করিলে কিরূপে? আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, বহু দিবস হইতে আমার মনের অবস্থা জানিতে চেষ্টা করিতেছি,

কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে সমর্থ হইতেছি না। যাহার আপনার মনের অবস্থা বিদিত নাই, সে আবার অপরের মনোভাব কিরূপে জানিতে পারিবে?"

একদা আবু ওসমান নামক এক ব্যক্তি মহর্ষিকে বলেন, "আমার ইচ্ছা, আমি এক্ষণে সাধারণ্যে ধর্ম্মকথা প্রচার ও উপদেশ প্রদান করিয়া ভ্রমণ করি।" ইহা শুনিয়া তপোধন কহিলেন, "কি কারণে তোমার অন্তরে এই ইচ্ছা বলবতী হইয়াছে?" তিনি কহিলেন, "বিধাতার সৃষ্ট মানবগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন জন্য।" আবু হেফ্‌স কহিলেন, "সাধারণের উপরে তোমার দয়া কি পর্য্যন্ত আছে?" আবু ওসমান নতভাবে কহিলেন, "আমার এতদূর দয়া আছে যে, যদি খোদাতায়ালা মুসলমান ভ্রাতৃগণের পরিবর্ত্তে আমাকে নরকানলে নিক্ষেপ করেন, তবে আমি তাহাতেও সম্মত ও প্রস্তুত আছি।" ইহা শ্রবণান্তে আবু হেফস প্রসন্নবদনে বলিলেন, "এক্ষণে তুমি ধর্ম্ম-কথা প্রচারেই প্রবৃত্ত হইতে পার। কিন্তু সাবধান, যখন উপদেশ দিবে, তখন শরীর ও মনকে শান্ত রাখিও; তোমার উপদেশে সভায় বহু লোকের সমাগম হইলে আত্ম-গরিমায় উৎফুল্ল হইও না। কেননা লোকে প্রকাশ্যে তোমার স্বভাব, ব্যবহার পর্য্য-বেক্ষণ করিবে এবং সেই অন্তর্য্যামী বিশ্বনাথ গুপ্তভাবে তোমার অন্তরের ভাব নিরীক্ষণ করিবেন।" এই অমূল্য হিতবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া আবু ওসমান সভায় গমনান্তর উপদেশ প্রদানার্থ বেদীর উপর উঠিয়া দণ্ডায়মান হইলেন; সকলেই

ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণে মনোনিবেশ করিলেন। এদিকে মহর্ষি আবু হেফ্‌সও সভার এক প্রান্তভাগে অলক্ষ্যে উপবেশন করিয়া রহিলেন। যখন উপদেশ সাঙ্গ হইয়া গেল, সেই সময়ে জনৈক অতি দরিদ্র ভিক্ষুক দণ্ডায়মান হইয়া সাধারণের নিকট বিনয়-নম্র-বচনে এক খানি বস্ত্র ভিক্ষা চাহিল। আবু ওসমান ভিক্ষুকের প্রার্থনা শ্রবণমাত্র দয়ার্দ্র হইয়া আপনার গাত্রবস্ত্র উন্মোচনপূর্ব্বক তাহাকে দিলেন। দানকার্য্য সাঙ্গ হইতে না হইতেই আবু হেফ্‌স দণ্ডায়মান হইয়া ওসমানকে কহিলেন, "মিথ্যাবাদি! বেদী হইতে নামিয়া আইস।" ওসমান কহিলেন, "আমি কি জন্য মিথ্যাবাদী হইলাম?" মহর্ষি কহিলেন, "তুমিই না বলিয়াছিলে যে, মানব জাতির উপর তোমার অত্যধিক দয়া? দানকালে তোমার সে দয়া কোথায় রহিল? যাহাতে স্বয়ং পুণ্যাধিকারী হইতে পার, তজ্জন্য তুমি সর্ব্বাগ্রে দানকার্য্য নির্ব্বাহ করিলে; সকলকে তাহাতে বঞ্চিত করিলে। যদি বাস্তবিকই তুমি মানবজাতির কল্যাণ কামনা করিতে, তাহা হইলে এ কার্য্য সত্বর সম্পাদন না করিয়া তাহাদিগকে সুবিধা-দানের জন্য বিলম্ব করা উচিত ছিল। সেই বিলম্ব হেতু হয়ত কোন ব্যক্তি দান করিয়া আজ এই পুণ্যের অধিকারী হইতে পারিত! অতএব বিবেচনা করিয়া দেখ দেখি, ইহাতে তুমি মিথ্যাবাদী হইলে কিনা? মিথ্যাবাদীর জন্য বেদীর সৃষ্টি হয় নাই; ধর্ম্মপরায়ণ সাধু পুরুষই তাহার যোগ্য।"

তদনন্তর মহর্ষি আবু হেফ্‌স হজব্রত পরিপালনার্থ পবিত্র

মক্কার উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। তিনি আরবী ভাষা জানিতেন না। যখন সুপ্রসিদ্ধ বোগদাদ নগরে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই সময়ে শিষ্যেরা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন যে, এক্ষণে মহর্ষির কথোপকথন সাধারণের বোধগম্য করাইবার জন্য জনৈক অনুবাদকের আবশ্যক; নতুবা বড়ই লজ্জায় পড়িতে হইবে। কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয়! ঋষিরাজ বোগদাদে উপনীত হইলে তপস্বিকুলশিরোভূষণ মহাত্মা জনেদ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে গ্রহণার্থ আপন শিষ্যগণকে প্রেরণ করেন, আবু হেফ্স তাহাদের সাদর সম্ভাষণে সন্তুষ্ট হইয়া মহর্ষি জনেদের আলয়ে পদার্পণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় এরূপ সদালাপ করিতে লাগিলেন যে, সকলে শুনিয়া অবাক্ ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাষার পারিপাট্যে ও শব্দবিন্যাসে অনেককেই পরাভব মানিতে হইল। বোগদাদের অনেক খ্যাতনামা লোক তাঁহার দর্শনার্থ আগমন করেন, তাঁহারা "মহত্ত্ব কাহাকে বলে" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় আবু হেফ্স কহিলেন "আপনাদের ভাষায় দক্ষতা আছে, অতএব অগ্রে আপনারা ইহার বর্ণনা করুন, পরে আমার বক্তব্য প্রকাশ করিব।" তখন মহর্ষি জনেদ আরম্ভ করিলেন, "আমার তাহাই মহত্ত্ব বলিয়া অনুমিত হয়, যে অনন্যদুষ্কর মহৎ ব্যাপার সম্পন্ন করিয়া নিজকৃত বলিয়া প্রচার না করে। আমি ইহা করিয়াছি, এরূপ বলা মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে।" ইহা শুনিয়া আবু হেফ্স কহিলেন, "আপনার কথা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি বলি, সূক্ষ্মরূপে অপরের বিচার করিয়া দেওয়া,

কিন্তু অপরের নিকট বিচার-প্রত্যাশা না করা, ইহাই মহত্ত্ব।” জনেদ এ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া সকলকে পালন করিতে অনুরোধ করিলেন। অতঃপর উভয়ের মধ্যে এ বিষয়ের বহুবিধ কথোপ-কথন হইল; বাহুল্য ভয়ে আমরা তাহার অবতারণা করিতে ক্ষান্ত রহিলাম।

অনন্তর মহর্ষি জনেদের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক আবু হেফ্স মক্কার পথে যাত্রা করত এক বিশাল প্রান্তর মধ্যে আসিয়া উপনীত হইলেন। এই স্থলে তিনি ষোল দিন পর্য্যন্ত জলাভাবে কষ্ট পাইয়াছিলেন। পরে একদা জলের নিকট উপস্থিত হইয়া “বিদ্যা ও বিশ্বাসের মধ্যে প্রধান কি?” এই বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে তথায় আবু তোরাব নখ্শবী আগমন করিলেন। তিনি আবু হেফ্সকে কহিলেন “তুমি কি জন্য এস্থলে অপেক্ষা করিতেছ?” আবু হেফ্স আপন বক্তব্য জ্ঞাপনপূর্ব্বক কহিলেন, “বিদ্যা ও বিশ্বাসের মধ্যে যদি বিদ্যার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে আমি জলপান করিব, অন্যথা করিব না; যথেচ্ছা প্রস্থান করিব।” মখ্শবী এই কথা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, “বুঝিলাম, তুমি এক-জন খ্যাতনামা পুরুষ হইবে, তোমার সুনির্ম্মল যশ দিগন্ত পরি-ব্যাপ্ত হইবে।” পরে তাপসপ্রবর মক্কায় উপস্থিত হইয়া এক স্থানে দেখিলেন, কতকগুলি দরিদ্র লোক অভাবের নির্ম্মম নিষ্পে-ষণে অতীব কষ্টে কাল যাপন করিতেছে। তাঁহার হস্তে একটী কপর্দ্দক নাই, কিন্তু তাহাদিগকে কিছু দান করিবার বাসনা

করিলেন এবং তখনই তাঁহার অন্তরে কি এক ভাবের উদ্রেক হইল যে, তৎপ্রভাবে তিনি এক খানি প্রস্তর তুলিয়া লইয়া বলিলেন "তোমার সম্মানের অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি এক্ষণে আমাকে কিছু দান না কর, তবে এই প্রস্তরাঘাতে তোমার মস্‌জিদের যাবতীয় আলোকাধার চূর্ণ করিয়া ধূলিসাৎ করিব।" ইহাই বলিয়া যথাবিধি সম্মান সংরক্ষণের সহিত পবিত্র কাবার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে জনৈক লোক অলক্ষ্যে উপনীত হইয়া তাঁহার হাতে একটী মুদ্রাপূর্ণ থলিয়া প্রদানপূর্ব্বক অদৃশ্য হইল। তখন তিনি সেই দৈবলব্ধ অর্থ মহানন্দে দরিদ্রদিগকে বণ্টন করিয়া দিলেন অনন্তর যথাকালে হজ-ক্রিয়া সমাপনান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

এক সময়ে আবু হেফ্‌স মহাত্মা শিব্‌লীর গৃহে চারি মাস অতিথিরূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। শিব্‌লী তাঁহার সেবা করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই; প্রতিদিন রসনার তৃপ্তিকর উপাদেয় পানভোজনে পরমাদরে অতিথি সৎকার করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সমস্ত করা সত্ত্বেও তিনি বিদায় গ্রহণকালে ধীরভাবে কহিলেন, "শিবলী! যদি কখন নেশাপুরে গমন কর, তবে পৌরুষ কারে বলে ও অতিথি সেবা কিরূপে করিতে হয়, তোমাকে দেখাইয়া দিব।" শিব্‌লী লজ্জাবনত বদনে কহিলেন, "তবে বুঝি আমার কোন ত্রুটি হইয়াছে?" আবু হেফ্‌স কহিলেন "ত্রুটি নহে, অতিথি-সৎকারে এরূপ ক্লেশ স্বীকার

করায় পুরুষত্ব হয় না। অতিথির সেবা এরূপে করা উচিত যে, যেন তাহাতে মন সঙ্কুচিত না হয়, বরং তাহার প্রস্থানে সঙ্কোচ বা ক্লেশ প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। পরন্তু যদি তাহাতে কষ্ট স্বীকার করা হয়, তবে তোমার অতিথির আগমনে অসন্তোষ ও প্রস্থানে মঙ্গল বোধ হইবেই হইবে। অতিথি-সেবায় যে এরূপ করে, তাহার পৌরুষ কোথায় ?" ইহা বলিয়া তিনি প্রস্থান করিলেন। পরে একদা শিব্‌লী নেশাপুরে আবু হেফ্‌সের ভবনে উপনীত হইলেন। সেই দিন তথায় আরও চল্লিশ জন অতিথির সমাগম হয়। আবু হেফ্‌স তদ্দর্শনে অতীব প্রফুল্ল হইয়া একচল্লিশটী প্রদীপ জ্বালিয়া চতুর্দ্দিকে আলোক-মালায় আমোদিত করিয়া ফেলিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া শিব্‌লী বলিলেন, "আপনি না বলিয়াছিলেন, অতিথি আসিলে কষ্ট স্বীকার করা কর্ত্তব্য নহে ?" মহর্ষি কহিলেন', "আমি কি কষ্ট করিলাম ?" শিব্‌লী বলিলেন, "কষ্ট স্বীকার করিয়া একচল্লিশটী প্রদীপ জ্বালার প্রয়োজন কি ? একটী জ্বালিলেই ত যথেষ্ট হইত ?" তিনি বলিলেন, "তবে তুমি নিবাইয়া দাও।" তদনুসারে শিব্‌লী প্রদীপের উপর ফুৎকার দিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাহাতে একটী মাত্র প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল ; সহস্র যত্নেও অপর চল্লিশটী নির্ব্বাণ করিতে সমর্থ হইলেন না ; তৎসমুদায় সমভাবে আলোক বিস্তার করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তখন শিব্‌লী আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া কহিলেন, "একি অপরূপ ঘটনা! আমিত কিছুই বুঝিতে

পারিতেছি না ?" আবু হেফ্‌স কহিলেন, "চল্লিশ জন অতিথি পরম পিতার প্রেরিত ; আমি তাঁহাদের প্রত্যেকের জন্য পরমেশ্বরের প্রীতি সম্পাদনার্থ প্রফুল্লচিত্তে এক একটী দীপ জ্বালিয়াছি এবং তোমার কারণেও একটী জ্বালা হইয়াছে। সেই একটী প্রদীপ তুমি নির্ব্বাণ করিতে পারিয়াছ ; কিন্তু অপরগুলি নিবাইতে পরাভব মানিলে। এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, ইহাকে ক্লেশ স্বীকার করা বলা যাইতে পারে না ; বরং ইহা বিশ্বনিয়ন্তার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাহার আর বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই।"

মহর্ষি আবু হেফ্‌সের তপস্বী-জীবনের ক্রিয়াকলাপের অলৌকিকত্বের ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহার কঠোর অধ্যবসায়, প্রভূত ত্যাগ-স্বীকার ও অদ্ভুত আত্মসংযমের বিষয় শ্রবণ করিলে হৃদয় অপরূপ বিস্ময়রসে অভিষিক্ত হয়। তাঁহার উক্তিসমূহ ধর্ম্মজ্ঞানলাভের ভাণ্ডারস্বরূপ। তিনি এমনি পূজনীয়, শ্রদ্ধেয় এবং ভক্তি ও সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পরবর্ত্তী সময়ে জনৈক ধার্ম্মিক ব্যক্তি আপন মৃত্যুর পরে আবু হেফ্‌সের পদতলের দিকে তদীয় মস্তক স্থাপন করিয়া কবর দিতে অনুমতি করিয়া গিয়াছিলেন। প্রিয় পাঠক ! এতদপেক্ষা ধার্ম্মিকতার অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন আর কি হইতে পারে ?

সমাপ্ত।

[illegible]পত্র ।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ ।
৬	১	জগতারাধ্য	জগদারাধ্য
,,	৩	বংশোদ্ভব	বংশোদ্ভবা
৭	২	পূর্ব্বে	পূর্ব্ব
৩২	৩	জ্বালা যন্ত্রণা	জ্বালা-যন্ত্রণা
৪১	১	আধ্যাত্মিকতত্ত্বরূপ	আধ্যাত্মিক তত্ত্বরূপ
৪৪	৫	কর	করণ
,,	১১	সর্ব্বাঙ্গীণ	সর্ব্বাঙ্গীন
৫৮	১	বল্‌খও	বল্‌খ ও
৭১	১	মাতাপুত্র	মা[illegible]াপুত্র
৮৫	১১	ভ্রাতৃগণ	[illegible]
৮৭	১১	প্রজ্বলিত	প্রজ্জ্বলিত
৯৫	৫	৮৭	১৮৭
১০৪	৯	নিষ্ঠাবন	নিষ্ঠীবন
১১৪	১৩	স্নেহ-প্রবল-হৃদয়	স্নেহপ্রবণ-হৃদয়
১১৬	১৫	যখন	কখন